



সপ্তম বর্ষ ॥ পৌষ ১৩৬৬

# অমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি  
ও  
পবেষণা কেন্দ্র  
৩৮/এম. ট্যামার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৮

নিখুঁত  
কেশভেলের  
সন্ধান  
পেয়েছেন কি?

আপনি যদি এমন কোন কেশভেলের সন্ধান থেকে  
যান—যা সম্পূর্ণ নিরঙ্গু হুং, যতই কোন কৃত্রিম  
কিছু থাকে না আর স্বাভাবিক বা বাজারিক ভেদে  
কোনো ক্ষেত্রে কোনো বিকল্পই আপনাকে দেবে



কৈয়ো-কার্পিন

৯ স্কটল্যান্ডের কোম্পানি  
ফ্রম নতুন জীবন দেয়

কৈয়ো-কার্পিন কোম্পানি লিমিটেড

কলিকাতা • যোবার্গ • দিল্লী • মাদ্রাস



সূচীপত্র

ভাষ্যদেবের প্রতাবর্তন। অমরনাথ সাম্যাল ৫৪১

উপন্যাস-আলোচনার পদ্ধতি। নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ৫৪৬

কৌতুকরস ও সাহিত্য। অজিতকৃষ্ণ বসু ৫৫০

সহজ কথায় বলা। বিষ্ণুদত্ত চট্টোপাধ্যায় ৫৫৬

সামিধা। চিন্তামণি কর ৫৬৪

অশ্লীলতা ও বর্তমান সাহিত্য। উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ৫৬৮

সৌন্দর্যতত্ত্ব : রবীন্দ্রনাথ ও স্বেচ্ছা। কল্যাণ সেনগুপ্ত ৫৭৫

কামিনী-কামুন। ভরস্বজ পতিভূঁই ৫৭৭

সংস্কৃতিপ্রসঙ্গে। সনৎকুমার রায়চৌধুরী ৫৮০

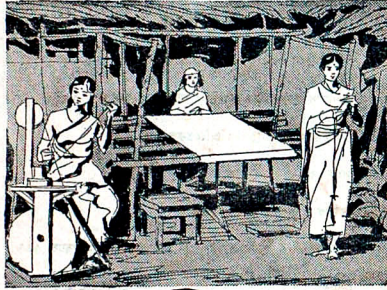
সমালোচনা—সোমেন বসু ৫৮২

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেস এ ওয়েলিংটন স্কয়ার  
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১০ হইতে প্রকাশিত।



# আমাদের প্রতি



আমার গভর্ণমেন্ট  
এশোরিয়ে আসুন  
৮, বসন্ত ষ্ট্রিট, কলিকাতা  
বাংলায় সংগ্রহ বিষয়ে লিখুন:  
ডিপার্টমেন্ট অব সেরিকালচার  
এবং উষ্ণতা  
গভর্ণমেন্ট অব আসাম, শিঙা  
অথবা আমায় সলভমেন্ট এশোরিয়ে  
কলিকাতা, নিক, বোহাই বা কলিকাতা

## কিনুন

কুচিসম্রাট, আমায়প্রদ  
সীত নিবরক



## ভীষ্মদেবের প্রত্যাবর্তন

অমিয়নাথ সাম্য্যাল

সম্প্রতি অর্ধাৎ প্রায় তিন বৎসর হল যখন শুনলাম শ্রীভীষ্মদেব দুর্যোগ্য ব্যাধির কবলে পড়েছেন, তখন মাত্র চিকিৎসকের দৃষ্টিতে মনে দৃঢ় পেরোছিলাম, তা নয়। ব্যাধির কারণে তিনি সাংগঠনিক শ্রুতিও হারিয়ে ফেলেছিলেন, একথা এবং আনুষঙ্গিক গল্প-গুজব শুনে নিতান্ত মর্মান্বিতও হয়েছিলাম। দুর্দৈব আর জড়তা, এরা যেন ষড়যন্ত্র করে ভাগ্য ও প্রতিভার মূলেচ্ছেদ করতে লেগেছে। ভাগ্য আমাদের, বাগলা দেশের; প্রতিভা হল ভীষ্মদেবের! ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেবের শিষ্যদের মধ্যে ভীষ্মদেব হলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ। আমি তাঁকে ভাল করেই চিনেছিলাম। আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট, কিন্তু কর্মে ও সাধনায় অনেক বড়ো তিনি। মনে পড়ে গেল,—আমি যখন কলিকাতায় গিয়া বাগানের বাসায় থাকতাম, তখন তিনি একদিন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন উমা বসুর বাড়ীতে। ভীষ্মদেবের সৌন্দর্য্য আর প্রহর ভুলতে পারিনি। তিনি উমা দেবীকে তখন চিমা ও মহা লয়ের খেলায় শিক্ষা দিতে সবে আরম্ভ করেছেন। শিক্ত সঙ্গীত-প্রিয় বাগলায় ঘরের মেয়ের মুখে সেই প্রথম শুনলাম বিলম্বিত লয়ের একখানি গান, আদ্যাক্ষ ১৯৩৭-৩৮ সাল হবে। চমৎকার গান, চমৎকার শিক্ষা, অসাধারণ গদ্য, অসাধারণ শিষ্য। ভাগ্য আর কাকে বলব! বাগলায়ীর মেয়েকে এ ধরনের সমৃদ্ধ গানে শিখিয়ে তৈরী করাই ছিল ভীষ্মদেবের নিজ প্রতিভাকে যেন যাচাই করে নেওয়া। নিজের সুস্থিতি নিজেই যাচাই করা শেষ কথা নয় বলেই তিনি নিতান্ত আগ্রহ করে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ভীষ্মদেবের ব্যাধির কথা শুনে সে সকল কথা মনে পড়ছিল। ভাবছিলাম, পর্বতের চূড়ায় উঠে গিয়ে হল সেই দুর্বিপাক! না জানি কোন অজ্ঞাত এক অভিশাপ ভীষ্মপ্রতিভাকে অনুসরণ করে আসছিল, গোপনে। খলিকা বদল খাঁ সাহেবের পবিত্র আত্মা তাঁর প্রিয় শিষ্যের এই অবস্থা দেখেও দেখছেন না! দৃঢ়-স্তব, সংযত-চরিত্র এই শিষ্যটির সাধনা কি তবে বিফলে গেল!

যাই হক, বৎসর দুই পূর্বে একটি সুযোগ পেয়ে কলিকাতায় ভীষ্মদেবের বাসায় এক



সম্মার উপস্থিত হয়েছিলাম, আমরা তিনজন। অর্থাৎ, ভীষ্মদেবেরই পুরানা সাগরের শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী আমাকে আর আমার বন্ধু ডাক্তার শ্রীহারিরণ দত্তকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সুরেশচন্দ্র বৃষ্টি আর পরিশ্রম করে গান শিখেছিলেন, তবুও সৌখীন সঙ্গীত-সেবার প্রেষীতে রয়েছেন। হারিরণ হলেন সুর-রাসিক, আর বাঁশা-বনোদ-কুতূহলী গবেষক একজন। মানব-পূজা নয়, সেবতা-পূজাও নয়; বাঁশা ও অন্য দু'একটি আলাপের যন্ত্রকে সেবা-শুশ্রূষা করে, বিবেক করে, আরও কত কী করে মন্দের ধ্বনিনন্দন করা যায়, তাই হল এঁদের সাধনা।

দেখা মাত্র ভীষ্মদেব আমাকে নিন্তে পারলেন। আমরা যত ঘরে বসেছিলাম, সেখানে সঙ্গীতের উপকরণ ছিল। ইতিপূর্বেই সুরেশের সঙ্গে পরামর্শ মতো ভীষ্মদেবকে অনুরোধ আর অনুরণ করে, গান করতে বললাম। কিন্তু তিনি এবং ক্ষণে ক্ষণে উদাস দৃষ্টি করে ভীষ্মদেব বললেন তিনি আর গান গাইতে পারেন না, তিনি সব যেন ভুলে গিয়েছেন, ইত্যাদি।

সুরেশ ইতিমধ্যে হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়েছিলেন। ভীষ্মদেব সুরেশকেই গান করতে বললেন। ভীষ্মদেবের কাছে শিক্ষা করা একটি গান সুরেশ গাইলেন। আর, তাকে অনুদান করতে লাগলেন যথা—আপনি এবার গানটি ধরুন; এত আপনায় গান; গাইতে আরম্ভ করলেই মনে পড়ে যাবে; আচ্ছা না হয়, একটু তান-বিস্তারই করুন। কিন্তু ভীষ্মদেবকে গান বা তান কিছুই ধরান গেল না। পরপর তিন চারখানি গানও তাঁর স্মৃতির গোপন কুঠুরীতে যা দিতে পারল না।

এই হতাশার মধ্যে একটি মাত্র আশাজনক ঘটনা লক্ষ্য করেছিলাম।

সুরেশ দ্বিতীয় গানখানি আরম্ভ করতই ভীষ্মদেব বাঁশা-তবলা টেনে নিয়ে সঙ্গত আরম্ভ করলেন। তাহলেই সাঙ্গীতিক স্মৃতির একদিকের একটি বাতায়ন মূক্ত চিত্রনের মধ্যে যোগ রক্ষা করেছে। শীত যদি এল, আসুক; জীবন থাকলে বসন্তের আগমন সেই বাতায়ন পথেই সমগ্র জীবনকে ধনা করতে পারে, এই হল আশার কথা। শব্দে তাই নয়। ওস্তাদ বলল খাঁ সাহেব দস্তুর মতো তালিম বাজনা—অর্থাৎ শিক্ষণ পদ্ধতি অনুযায়ী বাঁশা-তবলার বাজনা জ্ঞানেই বাঁশা-তবলার শিবাও তার ছিল। এবং, খাঁ সাহেবের হাতে তাঁদের ঘরের কিছু বিশিষ্ট ঠেকা-বোলও আমি শুনছিলাম। ভীষ্মদেব যেভাবে, আর অন্যসবে বোল বাজলেন, তার মধ্যে খাঁ সাহেবের আগশের নকশাও লক্ষ্য করলাম।

ফিরবার পথে পরামর্শ হল যে, সুরেশচন্দ্র সুযোগ সুবিধা পেলেই ভীষ্মদেবকে বদল খাঁ সাহেবের দেওয়া গান শুনিয়ে দেবেন; যখন তখন যা হয় একটা দুটা। নানা রকমের গান বা তেরোনা দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে, ভীষ্মদেবের স্মৃতিবেগ। কিন্তু, তাকে ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের দরুনাম শুনিয়ে পরীক্ষা করলে সফল হবে না। অন্য ঘরের গান শুনিয়েও লাভ নেই। আমাদের দেশে বৈষ্ণব ভক্ত জনের মধ্যে একটি প্রবাদ চলিত আছে; যথা “যে মনে পড়ে, সেই মোহেই ওঠে”। নাম-সংকীর্তনের অবস্থার ভক্ত সাধক ভ্রম উদ্ভাবনার যেন নাচড়ে নাচড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তাঁর চৈতন্য ফিরিয়ে আনতে হলে এক রাস মহাবৈধ হল—যে মন্দের বিশিষ্ট নাম স্মরণ করতে করতে ভক্তের সাত্ত্বিক প্রলয় ঘটে, উপস্থিত জ্ঞানো সেই বিশিষ্ট নামটিই সেই সাহেবের কানের কাছে বাবরার কীর্তন, উচ্চারণ করলে, সাধক আবার বাহ্য সিদ্ধি ফিরে পান। কাণ, নাম-মাহাত্ম্য ও নামশ্রবণের ইচ্ছাত একবেলেই লুপ্ত হতে পারে না। যাই হক, ভীষ্মদেবের অব-শ্রুতনার বদল খাঁ সাহেবের গানই হল প্রাচীন অথচ সর্বোত্তম স্মৃতি। দুর্ভাগ্য-দুর্ভাগ্যের কারণে এই স্মৃতি অবলুপ্ত। কিন্তু নষ্ট হয়নি। বাঁশা-তবলার বোলই তার প্রমাণ। খাঁ সাহেবের দেওয়া এক একটি গানের স্মৃতি তাঁর কানের মধ্যে দিয়ে বরমে প্রবেশ করলে, আপনা থেকেই তাঁর স্মৃতি নতুন করে স্মৃতিভূত হয়ে উঠতে পারে। সুরেশের স্মরণ হয় এমনই করে জাগে তা ভাল; নাচে,

ঔষধ দিয়ে চিকিৎসায় ফল হবে না। আর ভ্রমর যদি জাগল, তবে গানের ফুল ফুটেতে কতই বা দেবী হবে!

কিছুদিন পরেই সুরেশের মৃত্যুে সংবাদ পেলাম। ভীষ্মদেব সুরেশের বাসায় মাঝে মাঝে উপস্থিত হচ্ছেন, যদিও সময়ের ঠিক নেই। এবং ভীষ্মদেবের কন্ঠে সুর ও রাগের খণ্ড খণ্ড পরিকল্পনা দেখা দিচ্ছে। গানের কলি তখনও দেখা য়োনি।

একদিন সুরেশ আনন্দে গদগদ হয়ে খবর দিলেন ওস্তাদের কন্ঠে গান দেখা দিয়েছে। তবে, গানের সময়ে হঠাৎ কথা শ্রুত হয়ে যাচ্ছে। কথার খেঁই ধারিয়ে দিলে আবার গান চলতে থাকে।

সৌদন আমাদের বড়ই আনন্দের দিন। সুরেশের বাসায় যতক্ষণ আমরা বসেছিলাম, সমস্ত সময়টা কেটে গেল ভীষ্মদেবের সাধন-জীবন আর খলিখা বলল খাঁ সাহেবের প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গের ভেতরে আরও একজন গুণীর কথা বললাম, যিনি রোগের আক্রমণে গান এবং কন্ঠের দিকে দুইই হারিয়ে ফেলেছিলেন; গান যদিবা দেখা দিয়েছিল ত' কন্ঠের সজীব দক্ষতা তিনি আর ফিরে পাননি। গুণী গায়কের জীবনে রোগ উপস্থিত হয় অভিশাপ বহন করে; রোগ যদিবা চলে যায় ত' অভিশাপটি যেতে চায় না। এই হল গুণীর মৃত্যু।

সম্প্রতি, অর্থাৎ গত মে মাসে একটি ঘটনা ঘটে গেল।

সুরেশচন্দ্রের বাসায় (একডালিয়া রোডে) সম্মান্যবোলায় আমরা আড্ডা দিচ্ছি। আমরা তিনজনত' আছি; অধিকন্তু উপস্থিত ছিলেন শ্রীমন্ত রঞ্জনপ্রসাদ নিয়োগী, যিনি বাগ্গলা সরকারের শিক্ষা-বিভাগের উপস্থিত কর্মচারী; অরুণা সুর-রাসিক। সুরেশচন্দ্রের শ্রী স্মৃতি ও সুদায়িকা; তা ছাড়া অন্য বহুগণের গুণবর্তী তিনি। আড্ডাটি তিনিই জমিয়ে দিলেন খাসা চমৎকার সরব পরিবেশন করে। ফলে, আমার অনভ্যস্ত কন্ঠেও সুর এসে জমাছিল গুটি গুটি করে। সুর-স্রুতিদেরও লক্ষ্য-সম্ভব আছে; এমনকি দৈন্য বোধও আছে। ভাল আড্ডার গুণে ঐ বোধগুলি অন্তর্হিত হয়ে যায়।

বদল খাঁ সাহেবের কাছে একখানি তিলক-কামাদের খাল গান শিখেছিলাম। সেকালের সেই তিলক-কামাদের নজীর আজকের দিনে বেন-জীর। গানটি নিয়ে উঠে পাঠতে আলোচনা চলছিল। রূপকে বিবর্তন না করেও নেড়ে চেড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করা যায়। সেই রকম একটি প্রচুর স্নেহ-সম্ভারের দৃষ্টি দিয়ে আমরা সেই তিলক-কামাদের রূপ-সম্ভা পরীক্ষা করছিলাম। গানের দেহকে নিরাভরণ না করে, গানের পদ-মর্শা বজায় রেখেই তার প্রতি অপেক্ষার বিরাট গতি-বিস্তারের আর আকাশমুখ চমৎকার সম্ভাবনার বাস্তব অনুশীলন করছিলাম। বদল খাঁ সাহেবের ঘরের গায়কী ও সমগ্রজনের এই রকমেই বিশিষ্ট ছিল।

এমন সময়ে, অকস্মাৎ ভীষ্মদেব উপস্থিত হলেন; একটি তরুণকে সাথে করে। তার দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল মনে হল। দর্শন ও দৃষ্টি অতীতের ভীষ্মদেবের ভেতাই সৌম্য ও আত্ম-সমাহিত। আত্ম-পালারি কাতর চাহনি অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে তাঁর চোখ-মুখ থেকে। সেই ঘর, সেখানে ভীষ্মদেবের যৌবন বয়সের একটি ফটো স্থানান রয়েছে। বর্তমান ও অতীতের নিলক্ষণ মিলন প্রত্যক্ষ করলাম। চিকিৎসকের দৃষ্টিতে চাষাবস্তও হল।

সুরেশ গান বন্ধ করলেন। ভীষ্মদেব তা ও পান-জরায় আত্মীয় হয়ে আমরা তাকে গাইতে অনুরোধ করলাম। তিনি কিন্তু সুরেশকেই গান গাইতে বললেন। সুরেশ সেই তিলক-



কামোদ গানটি ধরলেন। আমার ধারণা হয়েছিল ভীষ্মদেব নিশ্চয়ই ঐ গানটি শিখিয়েছিলেন, এবং সে কারণে ঐ গানটি গাইতে বললেন। গানটির স্বাধী জন্মে গেলেই আমরা ভীষ্মদেবকে আবার অনুরোধ করলাম। কিন্তু তিনি হাঁ বা না কিছুই বললেন না। তার স্থিতীয়বার চা এল। তিনি ধীরে সুস্থে চা পান করলেন। পরে, পান-জরদায়ও মুখে করলেন। এবং ভাল করে সমাহিত হয়ে বসলেন। গান কিন্তু বন্ধ।

ভীষ্মদেব সুদূরশেখ বললেন গান ধরতে। সুদূরশেখ নৃতন একটি গানের মূখ-পাত করলেন। গানটি ভীষ্মদেবের কাছে শিক্ষা করা গানের অন্যতম। বিহাগড়া ঋষিপত্নী তার সেই গান,—অপূর্ব তার বান্দিত আর চাল-চল!

এত কাল ধরে গান শুনেন আমার অভিজ্ঞতা এই হয়েছে যে গান জিনিষটা মূলে দু'রকম। ভাল গানের কথাই বলছি। এক রকম হল প্রাণ-খোলা গান। স্থিতীয় হল সোকান-খোলা গান। বন্দুও দরজা খুলে দেন; সোকানবারও দরজা খোলেন। তবে প্রাণের দরজা আর সোকানের দরজায় কিছু ইতর বিশেষ আছে। ডাক দিলেই যে গান সর্বাঙ্গীন আত্মসমর্পণ করে, অন্তরের দরদ জানিয়ে দিতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে লোক-লৌকিকতা, বা তোম-ভায়-নামে, বা উইজো-ব্রেন্সিওর অপেক্ষা করেনা, সেই গান হল প্রাণ-খোলা গান আর, সোকান-খোলা গানত বলাই হয়ে গেল।

বিহাগড়ার এই গানটি ছিল প্রাণ-খোলা গান। প্রসঙ্গত, আমার জানিত বদল খাঁ সাহেবের ঘরের কোনও গানকেই আমি সোকান-খোলা গান মনে করতে পারিনি।

সূরেশচন্দ্র গান ও বিস্তার করে চলেছেন। ভীষ্মদেব আনমনে বসে আছেন। সামান্য বিরতির মধ্যে বিহাগ ও বিহাগড়ার বিস্তারের বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গ উঠল। সূরেশকে বলাছিলাম যে খাঁ সাহেব বিহাগড়ার বিস্তার শুুনায় দু'তলয়ে খণ্ডমেদ; আরম্ভ করে ফিকিরবন্দী রচনা করতেন এবং এর পরেই একটি লাগুই আবেহিত-তান করে ঝড়িত সূরের জাল গুটিয়ে নিতেন। বৎসমানা দু'দণ্ডতও করলাম গদু'গদু' করে 'সরগম' করে। বোধকরি, আধ মিনিটের বেশী সময় নেইনি। তবে, মাত্র প্রসঙ্গ করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল না। খাঁ সাহেবের গায়কির মধ্যে বিশিষ্ট ভাবে খণ্ড-মেদ-ফিকিরবন্দী তানের ভাজ থাকত। এবং এরকমের নকশাগুলি গানের বোলের সাহায্যেই ফুটিয়ে তোলা ছিল দস্তুরমতো কায়দা। ভীষ্মদেবও এরকম তান করতেন, এবং চমৎকার ভাবেই করতেন। সুতরাং, সম্প্রতি আনমনা ভীষ্মদেবকে এ বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায় কিনা এবং গান করতে উত্তেজিত করতে পারা যায় কিনা, এ কথা ভেবেই আমি একটু গদু'গদু' করেছিলাম।

মহত্তের মখেই ভীষ্মদেব গান ধরে নিলেন; অর্থাৎ গোটা গানটিই বার হয়ে এল তার কন্ঠে। শূদ্র গান নয়। কথা-শব্দ উচ্চারণ করার সময়ে যে বিশিষ্ট বাণী-রূপ এবং ভাজ খাঁ সাহেবের কন্ঠে দেখা দিত—মুখ চোখ হাত ও আগুনের চলন চালনে যে সব শূদ্র মন্থা প্রকাশিত হত, আবেগের সময়ে সেই মহাপ্রবীণ খাঁ সাহেব যে রকম দেহভাঙ্গি করে উঠতেন,—সমস্তই মূর্ত হয়ে উঠল ভীষ্মদেবের কন্ঠে, দেখে, চোখে, মুখে! ভীষ্মদেব গানের আবাহন করলেন। আর গানের সুগে অবাচীর্ণ হলেন খাঁ সাহেব। কখন কখন চোখ বুজে গান শুনেনি, আবার চোখ খুলে গান দেখেওছি। এটা আমার পুরোনো অভাস। কখন কখন চোখ বুজতে বাধ্য হয়েছি, আবার কখন কখন চোখ খুলে পরম তৃপ্তি আশ্বাস করতাম। এটা হল আমার পুরোনো অভিজ্ঞতা।

ভীষ্মদেবের দু'ভেঁগের কথা ভেবে; দু' বৎসর পূর্বে আমি বলিয়া বদল খাঁ সাহেবের আবার উদ্দেশে অভিযোগ করেছিলাম। খাঁ সাহেব যেন তার উত্তর দিলেন, ভীষ্মদেবের এই গানের মধ্যে দিয়ে।

ভীষ্মদেব গান গেয়েই চলেছেন। অথবা, সেই গানটিই অকস্মাৎ সুপ্তোখিত ভীষ্মকে আত্ম-বিশ্মিত করল থেকে উদ্ধার করে আত্ম-চৈতন্যের পথে চেনে নিয়ে চলেছে।

তার কন্ঠ থেকে হঠাৎ বার হয়ে এল খণ্ড মেদুর নকশায় ফিকিরের তান; গানের বোলকে আগ্রহ করে। একটির পর একটি তান, শেষে সুন্দর সুন্দর আবেহীতান! সম্পূর্ণ বদল খাঁ সাহেবের গায়কি। শুনলে, কোনও সমকদার বলবেন না যে এটা ফেরাজ খাঁ সাহেবের, ওটা আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের, বা অন্য কোনও শীর্ষস্থ ধরানার গায়কি।

পূর্বস্মৃতির ও সাধনার হারা চুনি পামাগুলি ঠিকরে উঠে পড়তে থাকে তার গানের মধ্যে, অবাধ ও অবিকল্পরূপে। গানের ভাবার্থ ছিল ভক্তিরানের আকুল আত্ম-সমর্পণ। ভীষ্মদেবের অন্তরায়্য সেই আত্ম-সমর্পণকে সার্থক করলেন, নৃতন করে আত্ম-সাক্ষ্যকারের চমৎকৃতি দিয়ে। সেই চমৎকৃতির মধ্যে কৃষ্ণ বিময় বা দীনতার অভিনয় ছিল না লেশমাত্র।

সূর, ছন্দের পথে আকুল আবেগ আর সঞ্চিত সঞ্চ্যকারকে সম্বল করে এই মহান পৃথক গানের টানে অগ্রসর হয়ে এলেন বর্তমানের গন্তব্য স্থানে। বদল খাঁ সাহেবের ঘরের সেই গান সেই আশ্চর্য গান! কিন্তু, এ থেকেও চরম কথা হল আত্ম-বিস্মৃত গৃহীর প্রত্যাবর্তনের মহিমা! ভীষ্মদেব যথাযথই প্রত্যাবর্তন করলেন বর্তমান চৈতন্যের মধ্যে।







রকমের—এই ধরনের এলোমেলো আংশিক 'বিচারের' দ্রাবিষ্টি ত অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। মূল্যায়নের চেষ্টার সূত্রেই সামগ্রিক বিচারের প্রশ্ন দেখা দেয়, উপন্যাসের শিল্পকর্মের জটিল সমগ্রতাবোধের জন্যই হেনরি জেমস্ এবং এফ. আর লিভিস এই মাধ্যমসম্পর্কিত যে কোনও আলোচনার প্রশংসা সঙ্গোই সম্বলীয়। সার্থক উপন্যাসের বক্তব্য, চরিত্র, স্টাট এমনকি ভাষা পর্যন্ত যে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা চলেনা, বক্তব্যের, দেশকালপটবিস্তৃত অস্তিত্বের সমস্যার কেন্দ্রীয়টানেই চরিত্র ঘটনা দানা বাঁধে, রূপসংহতি পায়—উপন্যাস পরীক্ষার এই মূল্যায়ন সূত্র আমরা জেমস্ এবং লিভিসই পাই। বক্তব্যের নিজস্ব যন্ত্রির অনিবার্য শৃঙ্খলাই কখনও ঘটনার শক্ত ফ্রেমে কখনও বা ব্যক্তিগত মনন আবেগেই চরিত্রের উভাস। উপন্যাস যদি নিছক কাহিনীসর্বস্ব হত, তাহলে প্রকৃত নিশ্চয়ই সমালোচনা মহলে এত সমাদৃত হতেন না। গতানুগতিক আলোচনার চরিত্র, সংলাপ, কণ্ঠা ইত্যাদি উপন্যাসের বিচ্ছিন্ন উপাদান হিসেবেই গণ্য, কিন্তু উপন্যাসের জীবনচরিত্রণ বিভিন্ন অংশ নিয়েই একটি সমগ্র বস্তু, সেই সমগ্রতারই তাদের সার্থকতা। আমরা খাটি জাতের উপন্যাসে চরিত্র, ঘটনা, বর্ণনাকে আলাদাভাবে পাই না, সমগ্রতার বিন্যাসেই এই জিনিষগুলো পরস্পরের সঙ্গো মিশে জীবনের সংহতি রূপ রচনা করে। জেমস্ বলেন

People often talk of these things (i.e., description and dialogue, incident and description) as if they had a kind of interne cine distinctness, instead of melting into each other at every breath, and being intimately associated parts of one general effort of expression. I can not imagine composition existing in a series of blocks, nor conceive, in any novel worth discussing at all, of a passage of description that is not in its intention narrative, a passage of dialogue that is not in its intention descriptive, a touch of truth of any sort that does not partake of the nature of incident, or an incident that derives its interest from any other source than the general and only source of the success of a work of art—that of being illustrative. A novel is a living thing, all one and continuous, like any other organism, and in proportion as it lives will it be found, & think, that in each of the parts there is something of each of the other parts. ঘটনাপ্রধান, চরিত্রপ্রধান কি বর্ণনাপ্রধান উপন্যাস—এই ধরনের শ্রেণীবিভাগে জেমস্ বিশ্বাসী নন .... the only classification of the novel that I can understand is into that which has life and that which has it not.

জীবন এবং শিল্পের কঠিন দায় উপন্যাসিককে ছোলেতে হয়। উপন্যাসের রূপকর্মের বিচারের নিরিখও এখানে পাই। দেশকালের সভ্যতা সম্বন্ধে যার কোনও গভীর মানবিক জিজ্ঞাসা সেই এই শিল্পমাধ্যমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ তার পক্ষে অসম্ভব। শিল্পী হিসেবেই তাকে সমগ্র-পটে ব্যক্তিগততার সমস্যাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করতে হয়, তাঁর জীবনের যথার্থ মূল্যবোধের সূত্রেই উপন্যাসের চরিত্র, ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ সংলগ্নতা পায়। লিভিস্ সাহেব বলেন

Is there any great novelist whose preoccupation with 'form' is not a matter of his responsibility towards a rich human interest, or complexity of interests, profoundly realized?—a responsibility involving, of its very nature, imaginative sympathy, moral discrimination and judgment of relative human value?

জীবনের মূল্যবোধের অভাবের জন্যই ফ্রেবোর-এর শিল্পচাতুর্য এত নিখল, তাৎপর্য-হীন। কনরাড ফরাসী ঔপন্যাসিকদের, বিশেষ করে ফ্রেবোর-এর রীতির এতিয়ে তাঁর পাঠ

গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ম্যাদাম বোভারির শিল্পকলার বন্ধনভার অভিযোগ কনরাডের নোষ্ট্রোমোর বিরুদ্ধে অনুচ্চার্য, অথচ এই লেখক উপন্যাসের রূপকর্ম সমান স্বয়ংনা ছিলেন। তার কারণ, জীবনকে তুলু করে শৃঙ্খলিত করে শিল্পখেলার তিনি মত্ত হননি :

Nostromo is a masterpiece of "form" in senses of the term congenial to the discussion of Flaubert's art, but to appreciate Conrad's 'form' is to take stock of a process of relative valuation conducted by him in the face of life: what do men live by? What can men live by?—these are the questions that animate his theme. His organization is devoted to exhibiting in the concrete a representative set of radical attitudes, so ordered as to bring out the significance of each in relation to a total sense of human life. ম্যাদাম বোভারি যে কেন মহৎ উপন্যাস নয়, তার উত্তর এই আলোচনাত্মক সূত্রেই পাই

উপন্যাস কাকার ব্যাপ্তিক ফর্ম'জা প্রয়োগে আমাদের বার বার দিশেহারা হতেই হয়। উপন্যাসে এই সংহতির ছন্দ, সমগ্রতার শৃঙ্খলা অবশ্যই সবক্ষেত্রে সমান নয়। এই ছন্দ কখনও আসে ব্যক্তিগত মননের আধারে, কখনও বা সমগ্রের স্তূপেই জীবনের বিপুল বিস্তার। প্রতিটি সং, দায়বদ্ধ শিল্পী নিজস্ব উপায়েই সমস্যাকে ধরার চেষ্টা করেন, কিন্তু ঐ ছন্দের মূল উপর ভিত্তিই মানবিক মূল্যবোধেই। তাই আমরা দৌখ, ফরাসী সমাজের অবক্ষয়ের যন্ত্রণা সম্পর্কে সঠিক চেতনার জন্যই প্রস্তুত রচনার একটি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণার প্রতীকী রূপেই সংহতি আসে; আবার, টলস্টয়ের এগিক উপন্যাস গোয়ার এ্যান্ড পীস-এ লেখকের জগদ্বিচারের টানেই চরিত্র-ঘটনার ভরণ-প্রবাহের মধ্য দিয়ে জীবন একটি বিশাল সমুদ্রের রূপ পায়।

উপন্যাসের চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হলে উপন্যাসের-আলোচনায় এত বিচারদ্রাবিষ্টি ঘটত না, বিশেষতঃ যখন আমাদের সমানে সার্থক আলোচনার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। দেশকালবিস্তৃত জীবন সম্বন্ধে শিল্পীর গভীর চেতনার জিজ্ঞাসা তার সার্থক রূপ খুঁজে পেয়েছে কিনা, কখনও মানতে চাই নি। অন্ততঃ এই বিচার-বিশ্লেষণের সূত্রে শিল্পীর সং প্রচেষ্টার মূল্যও আমরা বুঝতে পারতুম। আমরা শরৎচন্দ্রের ভাবালু গম্পের মতোতেই মজি, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'কে শুদ্ধ, শুদ্ধ তর্কবিতর্কের সারসংকলন বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকী জেমস্ মধ্যযুগের অস্তিত্বের যন্ত্রণার পটে গোয়ার ব্যক্তিগততার সমস্যাকে ধরার চেষ্টা করেছেন বলেই নানা অসম্পর্কিত সত্ত্বও 'গোরা'ই যে বাংলাসাহিত্যে প্রথম সং উপন্যাস-প্রচেষ্টা আমরা বুঝি নি। উপন্যাস-এর স্বরূপের বোধ না থাকারই 'গোরা' নন, 'শেখের কবিতার ভাবের চতুর মহারথীর নির্বোধ, হাস্যকর তুলনা আমাদের অসতর্ক, পরিপ্রতিবিম্ব, লক্ষ্যভ্রষ্ট সাহিত্যচর্চা তথা কৃষ্ণিকাির অনিবার্য পরিণাম।



## কৌতুক রস ও সাহিত্য

### অজিতকুম্ব বসু

কৌতুকরসের একজন বড় কারবারী—তার নাম চার্লি চ্যাপলিন—কৌতুকরসকে বলেছেন “a kind of gentle and benevolent custodian of the mind which prevents us from being overwhelmed by the apparent seriousness of life.” অর্থাৎ জীবনের গুরুগম্ভীর রতার চাপে হারিয়ে ওঠার হাত থেকে আমাদের বাচায় কৌতুকরস। এখানে বলে রাখি, চ্যাপলিন যাকে ইংরেজিতে বলেছেন হিউমার, তাকে আমি বাংলায় বলছি কৌতুকরস।

কৌতুকরসের আরেকজন সেরা কারবারী, আমার—এবং আরো অনেকের—প্রিয় লেখক স্টিফেন লীকক একে বলেছেন “Kindly contemplation of incongruities of the expressed in art” অর্থাৎ শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের জীবনের বিচিত্র অসঙ্গতিগুলোর সহন্য রূপায়ন। বলা বোধ হয় বাহ্যিক শিল্প বলতে ইনি প্রধানত সাহিত্য-শিল্পকেই বুঝিয়েছেন।

সাধারণত ইংরেজি ‘হিউমার’ শব্দটির বাংলা তত্ত্বমুখে আমরা বলি ‘হাস্যরস’। আমি তার বদলে বলছি কৌতুকরস, কারণ হাস্যরস হিউমারের ব্যাপকতা এবং ব্যঙ্গনা দেই, যা আছে কৌতুকরসে। হিউমার মাঠেই আমরা হাসি না, কিন্তু হিউমার মাঠেই আমরা কৌতুক বোধ করি।

কৌতুকরস সম্বন্ধে চ্যাপলিনের কথাটা ভালো। কৌতুকরসের অর্থ না বুঝিয়ে ইনি জোর দিয়েছেন এর সার্থকতা বোঝাবার দিকে, মেনে নিয়েছেন যে আমরা কৌতুক বোধ করি এবং সাধারণত ভালোও বাসি; কৌতুকবোধের মনোবৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক ব্যাখ্যার বোঝা তিনি আমাদের ওপর চাপান নি। খুব একটা নতুন কথা যে তিনি বলেছেন তা নয়, কিন্তু একটা কথার মতো কথা যে বলেছেন এইটেই বড় কথা।

সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা বলেছেন—এবং তাদের সে কথা বিশ্বাস করার যোগ্য ও বটে—সাহিত্যে পদ্য এসেছিল আগে, গদ্য তার অনেক পরে। মানুষ প্রথমে ভাবতেই পারে নি সাহিত্যে গদ্য কখনো ঠাই পেতে পারে, ভেবেছিল সাহিত্যের দরবারে আসন পাবার পক্ষে গদ্য যথেষ্ট পোষাকী নয়। তাই পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের সাহিত্যেই প্রথম রচনাগুলো সব পদ্য।

এই গেল ভাষার ক্ষেত্রে। রসের ক্ষেত্রেও তেমন প্রত্যেক দেশের সাহিত্যেই প্রথম এসেছিল গম্ভীর রস, কৌতুক রস তার পরে। হয় তো সাহিত্যসৃষ্টির গোড়ার দিকে জীবনেও কৌতুকরসে অভাব ছিল। তারপর ধীরে ধীরে জীবনে যখন কৌতুকরসে আবির্ভাব হলো, তখন সেই কৌতুক আবির্ভাবের প্রথম থেকে কিছুদিন পর্যন্ত ভাবতেই পারে নি সাহিত্যে কৌতুকও স্থান পাবার যোগ্য। ভবেছিল এ হলো হালকা জিনিষ, খেলো জিনিষ, সাহিত্যে একে জায়গা দিলে সাহিত্যের জাত যাবে। সাহিত্যে কৌতুক রস পরিবেশনের কথা কোনো সাহিত্যিকই তখন ভাবতে পারেন নি।

কিন্তু বিখ্যাত অমোঘ বিদানে মানবের প্রাণের তাগিদেই কৌতুক প্রবেশ করল সাহিত্যে। প্রথমে অতি সন্তপণে, অতি সকেচে, অতি মৃদু, পদক্ষেপে। যে যেন ঠিক প্রবেশ না, অনু-প্রবেশ, মৃদুবেদনায়ো চাটনি হিসেবে। অর্থাৎ সাহিত্যে যেন গম্ভীর রসটাই আলস, শব্দ-গম্ভীর রসের ভারে মনটা যখন বড় বেশী ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে, অতিক্রান্ত হয় সহন-সীমা, ক্রান্ত অবসান মন চায় একটু হালকা হয়ে হাফ ছাড়ুরার অবকাশ, তখনই সেই অবকাশ বিনোদনের

জন্মে আমদানী করা যেতে পারে কৌতুকরসের। অথবা গম্ভীরতাই সাহিত্যের জগতে স্বাভাবিক নিয়ম, কৌতুক শব্দ মাঝে মাঝে তার ব্যতিক্রম।

সাহিত্যরাসিকেরা প্রথমে কৌতুকরসকে কিছুটা অনুকম্পা, কিছুটা অবহেলায় সঙ্গেই গ্রহণ করছিলেন, একে গুরুত্ব দিতে চান নি। কিন্তু প্রবাদের সেই উত্তের মতো কৌতুকরস একবার একটু নাক গলাবার জায়গা পেয়ে তারপর ধীরে ধীরে বসবার, এমন কি শোবার জায়গাও করে নিল।

বলা হয়ে থাকে কৌতুকবোধের প্রকাশ যখন নিম্নম হয়ে ওঠে তখনই হয় বাগ্ম বা সাটায়ার, যার উদ্দেশ্যই হলো কাউকে তুচ্ছ বা হয়ে প্রতিপন্ন করা; অতএব বাগ্ম-কৌতুকে বা সাটায়ারে খানিকটা নিষ্ঠুরতা থাকে। সাটায়ারকে এজন্যেই কেউ কেউ কৌতুক সাহিত্যে গম্ভীর বা আদরের স্থান দিতে নারাজ। কিন্তু সাটায়ারের বা বাগ্ম-সাহিত্যের ওপর আমাদের এ ধরনের বিরূপ ধারণা থাকা উচিত নয়। বাগ্ম রচনা মাঠেই নিষ্ঠুরতা থাকবে অথবা বাগ্ম-রচয়িতামাঠেই সহানুভূতিহীন, নিম্নম হবেন, এ ধারণা ঠিক নয়। বাগ্ম-রচনার আড়ালে থাকতে পারে সশোষণের আন্তরিক কামনা, এবং অন্তরে মমতা আর প্রীতি না থাকলে কাউকে শোধরাবার জন্যে মাথা ব্যথা হতো যাবে কেন? সুতরাং সাটায়ারমাঠেই বিশেষভাবে বিষাক্ত হলে ভরা হবে এমন নয়; বরং রসোত্তীর্ণ বাগ্ম এমনও হওয়া সম্ভব যে যাকে বাগ্ম করা হয়েছে সে ও সেই বাগ্মের সরসতা উপভোগ করবে। অবশ্য এ ও ঠিক যে সে ক্ষেত্রে তারও থাকা দরকার উপযুক্ত রসবোধ, যাকে বলে স্পোর্টিং স্পিরিট।

যিনি কৌতুক করছেন তার সেই কৌতুক যদি মাঠা ছাড়িয়ে বাস্তবতায় তীব্রতার স্তরে নেমে আসে তাহলে তাকে বিশুদ্ধ হিউমার বা কৌতুকরস বলা চলবে না। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে কৌতুকরসের যে বর্ণনা দিয়েছেন স্টিফেন লীকক : “জীবনের অসঙ্গতিগুলোর সহন্য রূপায়ন”। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে আমরা যখন মাঠা ছাড়াই বা ভারসাম্য হারাই, কৌতুকরসের রসিক তা লক্ষ্য করেন তার ভীষণ চমক দিয়ে। আমাদের সেই মাঠা-ছাড়ানো ধপের সঙ্গে তার আপনাদের মাঞ্চবী মিশিয়ে তিনি তাকে নব-রূপায়িত করেন; তাইতেই হয় কৌতুক রসের সৃষ্টি।

শরৎচন্দ্র লিখিত “বামুনের মেয়ে” উপন্যাসের প্রিয়নাথের কথাটা মনে পড়ল। হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা করাটা শব্দের হোমিওপ্যাথ প্রিয় ডাক্তারের একটা ব্যতিক্রম। শব্দ, ব্যতিক্রম নয়, ব্যতিক্রমের ব্যাড়াবাড়ি। এখানে প্রিয়নাথ মাঠা ছাড়িয়েছেন এবং তার এই মাঠাজ্ঞানহীনতার মধ্যেই কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র পেয়েছেন কৌতুকরসের খোরাক। গোঁয়ে রোগীকে প্রিয়নাথ তার রোগের লগ্ন এবং উপসর্গগুলি সম্বন্ধে যে বিচিত্র জেরা করছেন এবং রোগীর মূলের কথাগুলির দ্রষ্ট ব্যাখ্যা করে তিনি যে অবস্থার সৃষ্টি করছেন, তাই নিয়েই অবশ্য কৌতুকরস সৃষ্টি করেছেন শরৎচন্দ্র। তাতে সত্যি মধুর কৌতুকরসেরই সৃষ্টি হয়েছে, তিত্ত বিদ্রূপরসের নয়, কারণ কথা-শিল্পী এখানে প্রিয় ডাক্তারকে দেখেছেন দরদভাটা দৃষ্টি দিয়ে; তাকে তুচ্ছ বা হয়ে প্রতিপন্ন করতে চান নি। আপনাতোলা প্রিয় ডাক্তারের প্রচণ্ড হোমিও ব্যতিক্রম গোড়ায় তার আন্তরিক পরোপকার প্রবৃত্তি, নিজের আধের গাছিয়ে নেবার মতলব নয়। সেই জন্যেই তার ব্যতিক্রম তামাসা দেখে আমরা যতই কৌতুক বোধ করি, তার প্রতি প্রীতিমিশ্রিত দ্রষ্টাও আমাদের ততই বেড়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে।

শেক্সপীয়ার তার নাটকে এঁকেছেন ফল্‌স্টেফের চরিত্র। ফল্‌স্টেফ মিথ্যাভাষণ, প্রপঞ্চনা, মদ্যপান ইত্যাদিতে পাকা ওন্দা, কিন্তু তবু তার চেয়ে শেক্সপীয়ার দরদ দিয়ে



একেছেন এমন শিশুসুলভ উজ্জল প্রাণশক্তি প্রাচুর্য; যে ফলস্টোফের ফলস্টোফিয়ানায় আমরা পরম কৌতুক রসে নিমগ্ন হয়ে উঠি। ফলস্টোফের ভালোবেসে তার চারপাশের সমস্তরূপে স্থাপান করেছিলেন শেক্সপীয়ার, তার সেই ভালোবাসার যাদু আচ্ছন্ন করে রাখে আমাদের মনকে।

যে হিসেবে আমরা কৌতুকরসকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি সেই হিসেবটী হচ্ছে এই যে আমরা যখন চলতি কথা বলি অম্বকের বেশ রসবোধ আছে অথবা একবারেই রসবোধ নেই, বলি অম্বক লোকটি বেশ রসিক অথবা বেসরিক, তখন রস বলতে বুঝি কৌতুকরস। সম্পৃক্ত কবি বলেছেন 'অরসিকের' রসস 'নিবেদন' এর বিতৃষ্ণনার কথা। এখানে রস কথাটা তিনি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়, কিন্তু আমরা যখন এই উক্তিটা উদ্ধারণ করি তখন সাধারণত রস বলতে কৌতুকরসই বোঝাই এবং বুঝি।

এই হিসেবের রসবোধ, অর্থাৎ কৌতুকরস-বোধ, যাকে ইংরেজিতে বলতে পারা যায় সেন্স্ অফ হিউমার (sense of humour) এ জিনিষ ভালোবাসা যত সুলভ মনে করি তত সুলভ নয়। এমন কেউ কেউ আছেন (ভগবানের ইচ্ছেয় তাঁরা সংখ্যায় বেশী নন) যারা হাসতে চান না, যাদের চেহারা, হাবভাব, চলন বলন, ধরণ ধারণ, কাণ্ড কারখানা দেখলে মনে হয় হাসতে মানা করে এদের ওপর সরকারী অর্ডিন্যান্স জারি হয়েছে। নিদ্রার এঁদের কাউকে দেখেই স্বর্গারী সূকুমার রায় কবিতায় 'রামগুরুড়ের ছানা'-দের কথা লিখে গিয়েছিলেন, হাসতে যাদের মানা। এরা কবিবার বিষয় পেলে বেশী হয়ে ক'দে ভাসতে পারেন, গম্ভীর হবার বিষয় পেলে প্রাণের আনন্দে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখ গোমড়া করে বসে থাকতে পারেন, কিন্তু হাসি এঁদের ধাতো নয় না। কোথায়, কখন, কেন হাসতে হবে বুঝতে পারেন না বলে হাসেন না; অথবা বুঝতে পারলেও হেসে খেলো হতে চান না।

সূকুমার রায় প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল, কবিতায় 'আবোল তাবোল' এবং গদ্যে 'হ-ব-ব-র-ল' লিখে বাংলা কৌতুকরসের সাহিত্যে তিনি যে যগান্তর এনেছিলেন, তাঁর সময়ে অনেকেরই তাকে যুগান্তর বলে বুঝতে পারেন নি, বরং তাঁর লেখাগুলিকে আবোল-তাবোল এবং হ-ব-ব-র-ল বলেই ভেবে নিয়েছিলেন। সূকুমার রায়ের স্বর্ণরোহণের পর আমরা বুঝতে পেরেছি তাঁর রচনাগুলি বাংলার কৌতুকরস-সাহিত্যে স্থায়ী সঙ্গদ্বয় হয়ে রইল। স্বয়ং বর্ণনাত্মক ও একথা বলেছিলেন, এবং এ ধরনের রচনাও তিনি কিছু কিছু করে গেছেন।

“এত ভগ্ন বর্ণদেশ, তবু রপভারা”

কবি ঈশ্বরগুপ্তর এই উক্তিটা নিয়ে আমরা বেশ একটু গম্ব' বোধ করি এই ভেবে যে আমাদের মনের প্রাণশক্তিটা রীতিমতো জোরালো, আমাদের রসবোধ যতানক ভীষণ। কিন্তু তবু আমাদের সাহিত্যের ব্যাপক ক্ষেত্রে কৌতুক রসকে আমরা কতটুকু স্থান দিতে পেরেছি?

সূকুমার রায় দীর্ঘ জীবন পেলে আবোল-তাবোল, হ-ব-ব-র-ল, চলচিত্তগুণী? লেখার পর 'গম্ভীর' সাহিত্যে হাত লাগাতে নিন্দা বলতে পারি না, কিন্তু আমরা বোধ হয় মনে মনে হাসির চাইতে অপ্রচেষ্টা বেশী সমীহ করি। তাই কমেডি'র চাইতে ট্রাজেডির মর্যাদা আমাদের কাছে বেশী। কৌতুকরসের উত্তম সাহিত্যিকের চাইতে একজন মহামাশ্রেণীর 'গম্ভীর' বা 'সিরিয়াস' সাহিত্যিককে আমরা বেশী সম্মানের দ্রোষ দেখি। কমেডি'র চাইতে ট্রাজেডি উচ্চতর, এ ধারণাটা বোধ হয় গ্রীক পণ্ডিত আরিস্টটল-এর সময় থেকেই চালু আছে, যেহেতু আরিস্টটল-এর 'পোয়েটিক্স' বা কাব্য-শাস্ত্রে ট্রাজেডি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে, কমেডি'র নয়। এবং এই কারণেই অনেক কৌতুকরসিক লেখকের প্রাণে শেষ পর্যন্ত বাল্য জাগে 'সিরিয়াস' অর্থাৎ গম্ভীর সাহিত্য রচনা করে কৌলিন্য লাভ করবার, অর্থাৎ জাতে উঠবার।

একথাটা আরো ভালো করে বুঝবার সময় এসেছে সাহিত্যে কৌতুকরস জিনিষটা কিছ'র কম 'সিরিয়াস' নয়, এবং কৌতুকরস সৃষ্টি গম্ভীররস সৃষ্টির চাইতে কম প্রতিক্রিয়া দাবী করে না।

দৈনন্দিন জীবন থেকে গম্ভীররসের খোঁজক সগ্রহ করা হয় তো সহজ নয়; কিন্তু কৌতুকরসের খোঁজক সগ্রহ করতে হলে যে সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, যে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন তা তার চাইতে অনেক বেশী দরকার। 'সিরিয়াস' লেখকের শব্দ, 'সিরিয়াস' হলেই চলবে; কিন্তু কৌতুকরসসম্পন্ন সাহিত্যিককে রসোত্তীর্ণ হতে হলে শব্দ, কৌতুকী হলেই হবে না, 'সিরিয়াস' ও হতে হবে। অনেকটা সার্কাসের সেই পাকা ক্লাউনের মতো, যাকে সার্কাসের 'সিরিয়াস' বা গুরুগম্ভীর খেলাগুলো আয়ত্ত রাখে হতে হবে, তার ওপর করতে হবে কৌতুকরস সৃষ্টি। এদিক দিয়ে খাটি ক্লাউনদের দায়িত্ব বেশী, কাজ ও বেশী শর, তাঁদের বিহনে সার্কাস ভালো জমে না, তবু তাঁদের আমরা তেমন গুরুত্ব দিই না, 'সিরিয়াস' ভাবে নিই না। এই হলো কমেডি-সম্প্রদায়ের জীবনের অন্যতম ট্রাজেডি।

বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ কৌতুকরসের প্রবর্তন বিষ্ণুমচন্দ্রই করে গেছেন বলা যেতে পারে। কৌতুক তাঁর উপন্যাসাবলীর এখানে সেখানে ছড়ানো আছে, তার ওপর তিনি বেশ জমাতভাবে কৌতুকরস পরিবেশন করেছেন তাঁর লোকরসিক, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে, কমলাকান্তের দপ্তরে। তিনিই প্রথম দেখালেন কৌতুককে চট্টা'ক মত থেকে উল্লেখ' তুলে নিয়ে সাহিত্যে শিল্পসম্মতভাবে পরিবেশন করে তাকে পরম উপযোগী এবং মূল্যবান কৌতুকরসে পরিণত করা যায়, অর্থাৎ সাহিত্যকে কৌতুকের রঙে রাঙিয়ে তোলা যায়।

কিন্তু বিষ্ণুমচন্দ্র একনিষ্ঠ কৌতুকরসেরই কারবারী নন, কৌতুকরচনা তাঁর ব্যাপক রচনাবলীর অংশমাত্র। একনিষ্ঠ কৌতুকরসিক ছিলেন গোলোকানন্দ মৃধোপাধ্যায়। বলা যায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীই ছিল আগাগোড়া কৌতুকরসে রপণী। বাংলাসাহিত্যে আজগুড়ি কৌতুক-কল্পনাকে তিনিই জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। গোলোকানন্দ (১৮৪৭-১৯১৯) তাঁর সারা সাহিত্যজীবন কৌতুকরস সৃষ্টি করেই কাটিয়ে গেছেন, গম্ভীর বা অশ্রুছলছল সাহিত্যরচনার দিকে তিনি হাত বাড়ান নি।

কিন্তু কৌতুকরসের অসামান্য শিল্পী হয়েও বাংলার পাঠক পাঠিকাহলের মন থেকে যে তিনি কিছুদিনের জন্য অনেকেরই মুছে গিয়েছিলেন, তার একটি মত বড় কারণ অশ্রুঝরানো কথাসাহিত্যের যাদুকর শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব এবং ব্যাপক প্রভাব। অশ্রু সাহিত্যের জোয়ারে কৌতুক সাহিত্য হার মনে ভেসে গেল।

সাহিত্যে যে আমরা হাসির চাইতে অশ্রুর খোঁজকেই বেশী উচ্চতরের মনে করি, এবং তাতেই বেশী আচ্ছন্ন হই এতে বিস্মিত হবার বেশী কিছু নেই, এবং কৌতুকসাহিত্য যারা সৃষ্টি করেন তাঁদেরও ক্ষোভ করা উচিত হবে না। এইখিনি করি ইয়েটস'-এর একটি কবিতায় পরীরা একটি মানবিশুদ্ধকে বলছে :

“The world's more full of weeping  
than you can understand.”

অর্থাৎ এ পৃথিবীটা যে কত কান্নার ভরা, তা তুমি আদর্শও করতে পারো না।

সত্যিই তাই। এ সত্যের দিকে পিঠি ফিরায়ে থাকা মানসেই আত্মপ্রবণতা, বাস্তবকে অস্বীকার করে মিথ্যার ঠুনকো স্বপ্নের মাথা গোঁজা। নিজেকে ফাঁকি দিয়ে ছুঁলিবে না সেখান সত্যের সঙ্গেশ সোজা মোলাকাৎ হওয়া ভালো। নেপথ্যে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর অবহ-সম্প্রীত বাজছে বলই, জীবনকে এত ভালো লাগে, এ সত্যটা হৃদয়গম্য করলে ক্ষতি কি?



মোটামুটি দরকমের কৌতুকরসিক আছেন। প্রথম রকমের কৌতুকরসিক তাদের রসিকতা দিয়ে জীবনের বেদনার দিকটা ভুলিয়ে রাখবার প্রয়াসী। এরা যেন সুড়সুড়ি দিয়ে জাগিয়ে তোলেন আমাদের অন্তরের পলায়নী বৃত্তিকে। শ্রিতীয় রকমের কৌতুকরসিক পলায়নী মনোভাবের দ্বার ধারেন না, দুঃখের দিকে মূখোমুখি করে তারা সেই দুঃখকেই রঙীন করে তোলেন। আমার ধন্যবাটা বেশ জোরালো করে বোঝাবার জন্যে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। একটা চরমশর্তিত আসামীর অন্তিম ভোরবেলা। আর আশ্চর্য্য বাদে লোকটি অনন্ত শূন্যে ফুলে পড়বে। জেলখানার পুরোহিত এসেছেন মৃত্যুপত্রের পথিককে শেষ প্রার্থনা করিয়ে শেষ ধর্মোপদেশ শোনাতে। হতভাগ্য বেচারার আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে তিনি শূন্য বিষম, নন, অসঙ্গ। একে মাঘ মাসের মাঝামাঝি, ভায় শেখরাগ্রি। দূরন্ত, হাড়-কাঁপানো শীত। শরীর কাঁপছে ঠকঠক করে।

পুরোহিতের মনে সন্দেহ, হয় তো আসন্নমৃত্যু ফাঁসীর আসামী যে শীতে কাঁপছে সে শূন্য বাইরের শীতই নয়। খানিকটা সহানুভূতিতে, খানিকটা তাকে আনমনা করে দেবার জন্যে তিনি প্রশ্ন করলেন “ভারী শীত লাগছে?”

ফাঁসীর আসামী রসিকতার হাসি হেসে বললে “সেজেনো ভাববেন না আজ্ঞে। আশ্চর্য্যটার ভেতরই দীর্ঘ গরম হয়ে উঠবে।”

আরেকটি চরম উদাহরণ। কাঠগড়ার আসামীকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শোনাতে গিয়ে বিচারক আবেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন। মুখের ডগায় এসে কথা আটকে গেল, ঠোঁট কাঁপতে লাগল ধরধর করে। ভারী মূখোমুখি ঐ কাঠগড়ার ভেতর যে মানুষ্টা দাঁড়িয়ে আছে, তাকেই তিনি একটি হৃদয়ের নির্মম যাদুতে বীভৎস মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চলেছেন। কঠোর কঠোর তাকে বাধা করছে, কিন্তু কন্যা এতে সার দিতে পারছে না। বিচারকের দূরবস্থা দেখে কৌতুক বোধ করে কাঠগড়ার আসামী হেসে বললে “কথটা বলছি ফেলদাদ না ধর্মবিভার। অমন ঢাক ঢাক গুড় গুড় কেন?”

দুঃখা উচ্চারিত হল। মরতে হবে নিশ্চিত জেনে কাঠগড়ার আসামী স্ববিশ্রিত নিশ্বাস ফেলে কৌতুকী কণ্ঠে বললে : “বাঁচা গেল।”

অর্থাৎ এদুপার ওদুপার একটা হয়ে গেল, বাঁচা গেল পেড়লাদের দোলা থেকে। মৃত্যুর মূখোমুখি দাঁড়িয়ে এ মৃত্যুর সঙ্গেই কৌতুকরসিকতার দুটী উগ্র উদাহরণ দিলাম। চরম দুঃখ সামনে দেখে তা থেকে চোখ ফিরায়ে নেওয়া নয়, কৌতুকরসের রঙে চরম দুঃখের মুখ রাঙিয়ে দেওয়া।

দুঃখ সাধারণ অপরাধী বা ভীমিন্যালের উদাহরণ মাত্র দেওয়াটা বোধ করে শোভন হলো না। তাই একজন বিপ্লবী শহীদের কথাও বলি, যেমনটি শুনছি। যেদিন খুব ভোরবেলা তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হবে, তার আগের দিন কয়েকজন বন্ধু তার সঙ্গে কারাকক্ষে শেষ দেখা করতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন আসন্ন মৃত্যু এতটুকু ছায়াও ফেলতে পারে নি তার মূলে। নিশ্চিন্ত হাসিমুখে তিনি বন্ধুদের অভ্যর্থনা করলেন। নিতান্ত সহজ কৌতুকে হেসে বললেন “কাল ভোরে শব্দরবাবড়ী চলে যাচ্ছে, তাই বন্ধু দেখতে এসেছে?” দেখা করতে এসে বন্ধুরা সবাই বিচলিত, বিচলিত নন শূন্য, তিনি যিনি পরদিন প্রত্যয়ে চিরদিনের জন্য শব্দরবাবড়ী চলে যাবেন। আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকাময় দৃশ্যকে তিনি সম্পূর্ণ জয় না করলেও অন্তত অনেকখানি সহজ করে নিয়েছেন হিউমার বা কৌতুকরসের যাদুমন্ত্রে। এখানে আমার মনে পড়ছে একেবারে গোড়ার বলা চার্লি চ্যাপলিনের সেই ব্যাথ্যাটুকু যে হিউমার বা কৌতুকরস :

“Prevents us from being overwhelmed by the apparent seriousness of life.”  
শেক্সপীয়ারের হ্যামলেট কথাপ্রসঙ্গে বলছেন : “There is nothing either good or bad but thinking makes it so”

অর্থাৎ কোনো কিছই নিজস্বগে ভালো বা নিজস্বগে মন্দ নয়, সব কিছুরই ভালোয় মন্দ্য নির্ভর করে আমাদের ভেবে নেওয়া বা দৃষ্টিকোণীর ওপর। অনেকটা এই কথাই কবি মিল্টন তাঁর কাব্যে শরতানকে দিয়ে এভাবে বলিয়েছেন :

“Mind is its own place, and in itself  
Can make heaven of hell, and hell of heaven.”

আলেকজান্ডার পোপের বিখ্যাত কৌতুকরসায়ক খণ্ডকাব্য “রেপ অব দি লক”-এর কাহিনী বাল। দুটী বনেদী বড়লোক অভিজাত পরিবারের ভেতর বেশ সম্ভাব। একদিন বিধাতার মনে হঠাৎ কি দুঃখীম জাগল, এ পরিবারের একটি তরুণ ও পরিবারের একটি তরুণীর চুলের ডগা থেকে অল্প খানিকটা কেটে ফেলল কাঁচ দিয়ে। তাই থেকে ভয়ানক ব্যাপার। দুটি পরিবারে মুখ দেখাদেখি বন্ধ, এবং পরিস্থিতি আরো সাংঘাতিক হবার সম্ভাবনা। দুটি পরিবারের সমান শূন্যভাষায়ী কয়েকজন মহোদয় বাস্তব দুই পরিবারের একটা আপোন রফা করবার চেষ্টা করলেন। বিফল হলো তাদের সমস্ত গুরুগম্ভীর প্রয়াস। তখন তারা আলেকজান্ডার পোপের শরণ নিলেন। পোপ সে যুগের সেরা কবি, বিশেষ করে কৌতুক রসে সিদ্ধহস্ত। তিনি করলেন কি? ঐ তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মনে দুই পরিবারে বিরাট মনোমালিন্য গড়ে উঠেছিল, তেমন ঐ তুচ্ছ ঘটনাকেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রক্ত চাড়িয়ে অসুখ কৌতুকরসে ভরপুর অনবদ্য খণ্ডকাব্য রচনা করলেন : “রেপ অব দি লক।” খণ্ডকাব্যটি দুই পরিবারেই পঠিত হলো। আর ভারী ফলে কৌতুকরসের প্রবল হাওয়ার কেটে গেল মনো-মালিন্যের মেঘ। কারণ কাব্যে কৌতুক করে ব্যাপারটাকে পোপ এমন হালকা করে নিলেন যে ঐ ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ অলাদা চোখে অর্থাৎ কৌতুকের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন দুঃপক্ষ। দুঃপক্ষই লক্ষিত বোধ করলেন নিজেদের হাস্যকর ছেলেমানুষির কথা মনে করে। ভাবলেন হি, একটা সামান্য ব্যাপারকে কি অসামান্য গুরুত্ব দিয়েছি। কৌতুকী কবির কৌতুকরসের মাধ্যমে মিটে গেল স্বগণ্ড।

সাহিত্যে কৌতুকরসের সত্যিকারের সার্থকতা কোথায়, এই কাহিনী থেকে তারই খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে। সর্বশেষে একটি চিত্রাশীল মনের খানিকটা চিন্তা উদ্ঘত করছি :

“It is shallow to count the humorous as opposed to the serious, for humour, true humour, is serious. It is no mere whim, fancy or caprice, but an outlook a special way of looking at people and things, a smiling philosophy of life.”

অর্থাৎ : কৌতুকরসকে গভীররসের বিপরীত মনে করা মত ভুল। কারণ কৌতুকরস, সত্যিকারের কৌতুকরসেও গভীরতা আছে। কৌতুকরস নিছক খামখেয়ালী, আজব বা উদ্ভট কপন্য মাত্র নয়—এ হলো একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ, সব কিছুর দেখবার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী, রসমধুর জীবন-দর্শন।



## সহজ কথায় বলা।

### বিষয়পদ চট্টোপাধ্যায়

অভিযান্ত্রিকদের বৈজ্ঞানিক বিচারে মেরুদণ্ডাশ্রয়ী জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি মানবজাতি। ওয়াশ-টো, শিম্পাঞ্জী, গরিলা বা মক্‌ট্রেঞ্জের বানর, হনুমান, জঙ্ঘ-এক কথায় ইরেজের 'সিমিয়ান' পূর্ব-পুরুষদেরই বংশোদ্ভূত। আমরা ঠিকই কি-না, সে বিষয়ে সম্পর্কভাবে গ্রহণযোগ্য কোনও প্রশ্ন জীবতত্ত্ববিদগণ আজও আমাদের হাতে তুলে দিতে পারেন না। তবে দু'শামান জগতের প্রাকৃতিক অভিযান্ত্রিক একাধারে সর্বশেষ ও অপর চিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ ছাে মানবজাতি, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অবশ্য আমাদের পরিদৃশ্যমান পৃথিবী-গ্রহ সম্পর্কেই এই দাবি করা হচ্ছে।

আমাদের ভাষার বিচারেও এই বিবর্তনবাদের মূলনীতি সমভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ মানব-জাতির আদিমবংশের ভাবপ্রকাশ ও কথোপকথনের লক্ষ লক্ষ বৎসরের অজস্র রূপান্তরের মধ্য দিয়েই আধুনিক যুগের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ভাবপ্রকাশ বর্তমান পরিণতি লাভ করেছে। অর্থাৎ দৃষ্টান্তে দু'একটি বিকৃত শব্দের যুগে যুগে পরিবর্তিত আকারে প্রয়োজনানুসারে নিরবচ্ছিন্ন তামিল দিয়েই বহু সহস্র পুরুষের বংশধরেরা আজ রকমারি কথার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেও আর বিশ্বাস বা তৃপ্তি কোনটাই বোধ করে না। একদিন সেই অকল্পনীয় অতীতের যুগে, মুখ-নিঃসৃত ধ্বনিই ছিল মনের একান্ত অপরিহার্য ও নিত্যনিমিত্তিক ভাব-প্রকাশের বাহন। আর আজ প্রগতিতে এই তাঁর গতিবোধের সঙ্গে তাল রাখতে অসমর্থ হওয়ায় ধ্বনির বাজনায়েই হয়েছে সওয়ায়, আর ভাষা বা ভাব হয়েছে তার নৈমিত্তিক বাহন মাত্র।

চলমান যুগের এই অস্বাভাবিক গতিবিধিপ্রভাবের সঙ্গে ভাবের ও বচনের সঙ্গতি রক্ষা করা কোনও চরমেই সম্ভব হচ্ছে না। মাইণ্ড ও ম্যাটারের লক্ষ্য মেনে আসার প্রকট হয়ে উঠেছে বাতিক-গ্রস্ত লোকবর্গের কেঁচোখোরা হয়রানির জ্বালান। যুগ-জীবনের নিত্যনতুন ভাগিদে, অজ্ঞানের নয়া নয়া ফতোয়ারা, বিশেষ করে দুনিয়ার প্রসারিত অনুসন্ধিৎসার বিচিত্র আসরের মালিকানার অশেষার হওয়ায়, মানুষ দেহের বর্বাচারে অস্বাভাবিক করেছে বহু পুণেই। ভাববৃত্তির আয়তনসংকুল মস্তিষ্কে এখন তার জীবনযাত্রার প্রধান অবলম্বন। বহু শতাব্দী পঞ্চতের এই আবিষ্কারের নৈমিত্যগত হলেও বর্তমান যুগের যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক সভ্যতার পাঠভূমি সমূহই এর ব্যস্তত প্রয়োগকতা—অবশ্য কিছুটা উল্টোরকমে। এই প্রসঙ্গে এমন একটি অশুভের নাম করতে হয় যাদের সৃষ্টির ক্ষেত্র থেকে ভাববাদের আগাছা নাকি সমূলে উপভূমে ফেলা হয়েছে। অবশ্য বস্তুবাদের বেনামায় ভাববাদের কার্যকরী যদি কারুর পক্ষে মেনে নিতে কোনও বাধা থাকে, তবে অন্যভাবেও বলতে পারি। তখন বলবো—যান্ত্রিক সভ্যতা এটাই প্রতিক্ষেপে প্রমাণ করেছে যে, দেহের চেয়ে মস্তিষ্ক বড়, মস্তিষ্কের চেয়ে বুদ্ধি বড়। কাজেই কথা দাঁড়ায় জীবিক প্রয়োজনের চেয়ে উপলব্ধি বা মানসিক চাহিদা তাঁরতর।

এখন কেউ যদি তর্ক করে বলেন—বুদ্ধিজীবী মস্তিষ্কের বিলাস যতোখানি উপভোগ করেন, প্রমজীবী ততোখানি করেন না। তার উত্তরে বলা যায়—স্বল্পভাবে জৈবিক বা দৈহিক উপকরণ ভোগ যেমন অভ্যাস-সাপেক্ষ তেমন মানসিক সভ্যতার রসাস্বাদনও চর্চা-সাপেক্ষ। জীবনে পারিপার্শ্বিক প্রভাবে ও গ্রাসাচ্ছন্ন মতোবার তাগিদে যিনি যেভাবে রুচিতে অভ্যস্ত হয়েছেন, তাঁর কাছে সেই পন্থাই অধিকতর সহজভোগ্য।

কাজেই 'যেই শব্দ সৃষ্টির দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করা হয়, তাহাই ভাষা'—এই সাবেকী সংজ্ঞা বর্তমান যুগে অচল। আধুনিক যুগে কথা কেবল হৃদকন্দর থেকে ভাবের মূর্তিবিধান করেছে কত'বা সম্পন্ন করে না। পরস্তু তার প্রতিটি শব্দের বাজনা, বাক্যভগীর বৈশিষ্ট্য ও যতি-চরণের বিন্যাস শ্রোতা ও পাঠকের গলায় গোমোছা দিয়ে, এক রকম জলুদম করেই বিভিন্ন জীবনবন্দী আদায় করে নেয়। চিন্তার রাজ্যে মানুষের যতোই আধিপত্য বাড়লো, ততোই ভাব-কীল্যাসের কলা-কৌশল ও কায়দা-কানুন তার অধিগত হল। মানবসামাজে একদিন ব্যস্তগত জীবনের নিত্যত স্থূল আশা-আকাঙ্ক্ষার ও ভীতি-বেদনার প্রকাশকেই কথের রূপ দিতে কতো শতাব্দীর রম্য-মস্তিষ্ক ও বাক্যবস্তুর যুগলপ করতে হয়েছিল। আর আজ সেই ভাষাতত্ত্বের ভবিষ্য ইতিহাসের গতি ভাবানুভূতির স্বেচ্ছাচারে এতোই পীড়িত যে, তাকে প্রকৃতিস্বপ্ন করে দু'হৃদয়ের জন্য একটু পরিচিতি হয়ে ভাব বিনিময়েরও সুযোগ নেই।

বলি কার সঙ্গে আপনি কথা কইবেন? যে নিজের প্রমত্ততার নিজেই বেহুশ তার বস্তুবোধ মূল্যায়ন কখনও সম্ভব কি?

আধুনিক ব্যাখ্যায় গতিই নাকি জীবন। একথাটা আদিমযুগের যাবাবর জীবনেও উপলব্ধ হয়েছিল। কিন্তু ব্যস্ততের তারা অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল হয়েই জীবনকে কবায়ত্ত করলেন। পঞ্চতের, গথ, গল ও ফোনসে জাতিগুলি স্থিতিশীলতার অভাবেই বিশ্বাসরকর সভ্যতার নাগাল পেয়েও গতিশীলতার অস্বাভাবিক প্রাচুর্যে উল্কাপিণ্ডের মতো ছাই হয়ে শূন্য ভূমি আমাদের জন্য রেখে গেলেন।

জীবন-যাত্রার এই অস্বাভাবিক গতি-প্রতিযোগিতা সৃষ্ণ জীবনবোধকে আজ এতোখানি বিব্রত করেছে প্রতি পদক্ষেপে, যে, সাগরহারা হয়ে দেহ-রথকে নির্যাতন হাতে ছেড়ে দিয়ে স্থব্রতির নিঃশ্বাস ছেড়ে যেন বাঁচি। অতীতের দিকে ফিরে তাকাবার আর অবসর কই? জীবনের কোনো একটি দ্রুতগমনকে কেন্দ্র করে গাঁড়াবার চেষ্টা করতে না করতেই, প্রগতি তার স্বভাবসংলভ অমিত-ক্রমে দ্রুতগমনে পরিধির আবর্তন শূন্য করে। তাই উৎকোষিত জীবনের বাঁধনে উদাস শূন্য অনিশ্চয়তার রঙীন ফসল আহরণ করেই সার্থকতার তৃপ্তি খোঁজে। এখণেরে কুয়াসাজ্ঞর অপেক্ষতর জীবনালেখাই তার মানস-রসায়নের একমাত্র উৎস। এই ভবের সাংস্কৃতিক হাতে আজ ভাষারই পাইকারি কারবার, কল্পনার রসানই মূল্যমান, আর বাণীবিন্যাসের চক্কার-জুজুচাইই বাবসায়-বুদ্ধির সরস নিরিখ।

কাজেই আজকের দিনে নেহাৎ সহজ কথায় কিছু প্রকাশ করার চেষ্টাকে বৈবেলীয় জারণ সৃষ্টির প্রমাণ বলে উদ্ভাসিক উচ্চারণকে সমীহ না করে উপায় কি! চিন্তার সৈন্যকে কথার ফানুস দিয়ে যারা রোশনাই চড়াতে অভ্যস্ত, ভাবমূর্তির রিকটসূকে যারা মোগল শিম্পাদর্শ বলে চিহ্নিত করতে উৎসাহী, কথার অসংলগ্নতাকে যারা নিয়ম বাহুর প্রবেশপথ বলে বাহাদুরীর দাবিদার, তাদের সমাজে বাক্যসমূহিত করার পূর্বে অনেক কিছুই চিন্তা করে দেখতে হবে।

প্রথমেই ভাবতে হয়, আমার কণ্ঠ যে-কথা উপসারণ করে সে-টা কি আমার নিজেরই প্রয়োজন, না অপর কারুর ইমোশনের তাগিদে। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, আমার কথা সৃষ্টি করার প্রেরণা নিজের থাকলেও তাকে ব্যাখ্যা করার দাবিও আমার কিছই আছে কি? অর্থাৎ আমি যা কিছু মূখে বলে বা কাগজে লিখে প্রকাশ করছি তার ভাষা কি কোনও বিশৃঙ্খলনের পাণ্ডিত্যের দ্বারা জারিত করিয়ে আমাকে নূনন করে বসতে হবে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই ধরণের উৎপাদন থেকে রেহাই পাননি। ঘরোয়া পরিবেশে ও পল্লী আবেষ্টনের সহজ-সরল ও সাবলীল (কণ্ঠনিঃসৃত) বুলিতে যাকে 'আইডিলিক' বুদ্ধি পীড়িত কবিতাগলোর ব্যাখ্যাও কণ্ঠ-



কল্পিত বৈদ্যের কসরতি দেখে এই সব সাহিত্যিকেরাও তিন একাধিকবার সমালোচনা করেন। সহজ-সরল ভাবে ঋজু হৃদে ও অনাড়ম্বর ভাষাতে প্রকাশ করতে অনেকেরই কুণ্ঠা আছে লক্ষ্য করাই। কবিগুরু তাঁর সমসাময়িক তত্ত্ব কবিদের লক্ষ্য করেই সম্বোধিত করেছিলেন—

“সহজ হাঁস সহজ হাঁস

ওরে মন সহজ হাঁস—

আপন বচন রচন হ'তে

বাহির হ'য়ে আসবে কবি”

একটু নিবিড়ভাবে দৃষ্টি দিলেই দেখা যায় এই প্রেরণার লেখকদের মধ্যে আবার দুটি উপবিভাগ আছে। প্রথম দলে রয়েছেন যারা তাঁরা সংস্কৃত সাহিত্যাদর্শে ভারি বা মাঝের অনু-করণে যমক ও শ্লেষ পদ্ধতি। আমাদের দুর্ভাগ্যই হক বা সৌভাগ্যই হক সাহিত্যিক কার-কৃতি, সমালোচনা পদ্ধতি ও প্রগতিশীল ভাব-ভাণ্ডায় যুরোপীয় জ্ঞানভাণ্ডার থেকেই আমরা সংগ্রহ করেছি। একারণ স্বতঃই বৈদেশিক শব্দের প্রয়োগ আমাদের বানিতকা প্রলুপ্ত করে। সেই মতে বলতে গেলে, উপরোক্ত সম্প্রদায় পান, কুইবলস ও পেরিট্রাসিসের খুঁই পক্ষপাতী। এগুলি অনেকটা ছন্দসম্বন্ধী। বাক্যকে কাবিক অলঙ্কার করাই এর মূল অনুপ্রেরণা। ভাব এখানে গৌণ, বাক সৌকর্যই এর চরম অবধান। স্বতীয় দলে আছেন যারা আধিকাংশক্ষেত্রেই বিদ্যায়তনের বৈদ্যগামাণ্ডিত চাপরাশিওয়ালা ব্যক্তি। সোজা কথায় তারা পণ্ডিত। হয়ত দেখা যাবে তাঁদের বেশির ভাগই পেশাগত ভাবে বিদ্যাচর্চাকারী। তাঁরা কথা বা শব্দ শিল্পী মোটেই নয়। যমক, শ্লেষ ও সমার্থক বাক্যবিন্যাসের চটকদারী ক্রীড়ানৈপুণ্য এদের খাতে পোষায় না। এরা ছত্রে ছত্রে পঙ্খতির শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করে যত-তত পণ্ডিতদের পুঁলিশি প্রহরা মোতামেন করেন। তবে শব্দালঙ্কারের দিকে এদের নজর লুপ্ত নয়। এটা ইচ্ছাকৃত না হলেও বহুক্ষেত্রেই সাম-ধের অভাব। সেই অভাব তারা অবশ্য ভাবের হট্টের গভালিকা সৃষ্টি করে পূরণ করেন। একটি কথা বোঝাতে গিয়ে দশটি প্রাসঙ্গিক ভাবরূপের আদানি করেন। অবশেষে নিজদের পণ্ডিতেই নিজদের দুটি শোষণাতে গিয়ে পৃথিবীবাণী জ্ঞান-ভাণ্ডারের বিবক্ষণ থেকে যত-তত এলুপ্তান জুড়ে-তেড়ে একটা সুরাধা করেন। এর একমাত্র কারণ, অসাহিত্যিকের লাভিত-প্রয়াস। এ-সব সাহিত্য-কৃতি রসোত্তীর্ণ হওয়া দূরে থাক, সাহিত্যের মন অববর্তিত করে, ভাষার কৃষ্ণতা সৃষ্টি করে। তবে তাঁদের মনোবা ও পান্ডিত্যের সুবাদে জনগণ প্রায়ই নেহাৎ প্রমথ-বশতই বিস্ময় মন্তব্য করেন না। তা ছাড়া, ক্ষেত্র বিশেষে কিছু বিস্ময় সমালোচনা থাকলেও বাবসায়-বান্ধীর ব্যাতির সে-সব প্রকাশিত করতে সম্পাদকগণও লিখা বোধ করেন।

ওপরে ভাষার সঙ্গতিবিহীন দুরূহতা ও ভাবের কৃষ্ণাটিকা সৃষ্টির জন্য প্রত্যক্ষভাবে কথা দারী তাঁদের আমরা মোটামুটি ভাবে সমাজ করলাম। কিন্তু এই বাহা— অগেগে গা সে কথা বলতে গেলে, প্রথম কথায়—সাহিত্যিক সত্যতার সৃষ্টিকলা বগে ও শেষ কথায় পাশ্চাত্য চর্চন ইতিহাস সাহিত্যের আমাদের দেশের ব্যক্তিগত চিত্তাক্রান্ত ক্ষমতায়ী রপণী প্রভিফলন।

এখানে আমরা বিচার করে দেখবো, এই ধরণের দুরূহাভ্যাস স্বরূপ কি, এবং এর দ্বারা আমাদের সাহিত্যের তথা সমাজের কিভাবে অবক্ষয় হচ্ছে।

গোড়াতেই আমরা বলতে চাই, ভাষার দুরূহাভ্যাস বলতে আমরা কোনও ব্যাকরণগত তথ্যের অবতারণা করতে উৎসাহী নই। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর— অক্ষরকুমার—শঙ্কম—মাইকেল যুগে ছাত্রদের বাল্য শরচ্চয় যুগে প্রবেশের আগে সেগেই বাংলা ভাষার পদবিদ্যাস ও ব্যাকরণ-গত দুরূহতা প্রায় অতিক্রান্ত হয়েছে বললেই চলে। পূর্বে ছিল প্রাতিশব্দগত সরলীকরণের

অব্যাহত্যা, আভাস দেওয়া হয়েছে বাহন ও সওয়ারের পরপরের অবস্থান-বিনিময় প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে। আধুনিক চলিত বা সাধু যে-ধরণের কাঠামোয় মধ্য দিয়েই বিচার করি না কেন, প্রাতিশব্দগত অপসৃতি বা ব্যাকরণগত দৃষ্টতা উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু প্রায় কোনও ক্ষেত্রেই নেই। অবশ্য দুরূহত্ব ও দুরূহত্ব কিছু পরিমাণে ঠিকই আছে। তবে যত গোল-বাঁধে রচনাধর্মের ভাববস্তু প্রভিফলন ও প্রভিফলন।

এবার কয়েকটি কাপনিক উদাহরণ যে ধরণের রচনা সমূহকে উদ্দেশ্য করে বর্তমান নিবন্ধ রচিত হচ্ছে। দিলে আমরা আমাদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করবো।

(১) যখন বিক-বলয়ের বহিঃকলায় দিনমার্গ রক্তগণে শেখাবারের মলান দৃষ্টি নিমেষে করিয়া অস্তচালের নিকটবর্তী হন, তখন নিমসগ গোখলির রূপেখা ধূলিশূণ্য পাণ্ডুরতার পরিণত হয়। রূপসীলি বিয়োগ-বিধুর মূহনায় কি' কি'রবের একতান অবাক বৈদ্যনা ভাবকের হৃদয়ে মর্দির আরোহের সৃষ্টি করে। বিশ্বজগৎ তারম্বরে মনে তাহার স্বাতন্ত্র্য যোষণা করিতেছে। অমিত-বিলম্বে পূর্বশির কৃষ্ণ চন্দ্রাতল অপসারের করিয়া রৌণ্য পসরা লইয়া স্বিতীয়ার চাঁদ স্বায়ী অধিকার বিস্তার করিলেন। (সাধু, ভাষায়)

(২) একটু অনানন্দক ছিলুম। পশ্চিমের এই নেড়া শিমুলে গাছটার দিকে দৃষ্টি পড়ল। শীতের এই নিরাভরণ সায়সে গোখলিতে প্রকৃতির একি সালসলার পরিহাস। মনে হচ্ছে সিঁদুরে লালের ছড়াছড়ি দিগন্তের নিমসগ রূপরেখার শেষ স্ক্যানিমাটিকুও রাণিয়ে রাখতে চায়। তার সপ্তমের শেষ নিমসগটুকু গোখলি রঙের নিশান উঠিতে দেখলে রাখতে চাইছে। তার এই আয়াস আঁচরেই সফলতার ফসল বয়ে আনলো। দীপা-বলির আলোক-সম্ভ্রম এটি ভিতর তার রূপের ডালি নিয়ে পূব আকাশে চাঁদ হেসে উঠলো। (জ্যোতি রূপ)

উপরোক্ত কল্পিত নমুনা দুটির প্রতি একটু লক্ষ্য করলেই আমরা বস্তুতে পারি ভাব ও ভাষার পণ্ডিত দৃষ্টি থাকলেও অশ্রুটি প্রাতিশব্দগত ও দুরূহত্যা। এই দৃষ্টান্ত দুটিতে মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে, অনিপুণ লেখকের ভাষাজ্ঞানের স্বল্পতা ও নৈসর্গিক চিত্র চিত্রণের অক্ষমতাই প্রকাশ পাচ্ছে। এর বেশি কিছু মন্তব্য করা সম্ভব নয়। অক্ষমতাই যেখানে চোঙিত যায়, সেখানে সমা-লোচনা স্বতঃই করণোদ্র। কারোই পরের কথায় আসা যাক। স্থানের স্বল্পতা হেতু চলিতরূপের আদর্শ কল্পনা করেই বিচার বিবেচনা করবো।

সাহিত্য সেবার মধ্য উদ্দেশ্যে জীবনকে গতিময় করা। স্বাধীন-স্বাধীন ঐতিহ্যে বিরোধের ইপিগত বহন করে আনা। আমাদের ভুললে চলবে না জীবন-বর্ধনের মূল্যায়ন রসানুভূতির মাদকভায় কল্পচাচারী হওয়া নয়। সমাজ-জিজ্ঞাসা যেখানে ভাবালুতার আবেশে শেষ হারায়, জীবন-বর্ধন যেখানে উৎকর্ষতার তড়ান্য যাচ-এয়ার উৎকর্ষিত উত্তেজনা যোগায় সৌন্দর্যবোধকে কার্পণের অনুকম্পায় সংকুচিত করে, সেখানে চাই লেখকের আশুপ্রত্যয়ের স্বকীয় বলিষ্ঠ নীতি। জীবন-বোধকে জাগ্রত করা যদি সাহিত্য-ধর্ম হয়, তবে অবহেলিত মনুষ্যের উদ্ভীপনে পরমত সহিষ্ণুতার আশ্বিনীকায় উত্তীর্ণ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ শিল্পটিকে আত্মবলি দিতে হবে, তবে আত্মোৎসর্গ নয়। বাণীকে নবতর রূপ



দিতে হবে, ধনিবে নয়। আর সেই সঙ্গে সাহিত্যকে ঐতিহ্যময় করতে হবে ইতিহাসের গভীরগত অনুসন্ধান না করে, সাধনাকে সাধের প্রহরায় সীমাবদ্ধ না করে।

উপরোক্ত অন্তর্দৃষ্টিতে পূর্ববর্ণিত বাক্যবিশাশী যাদুকে দিগের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কথার তুচ্ছ হুড়ে সাহিত্যের ভাবকে তারা রাগিন ফুলফুলির চমক সৃষ্টি করেন। এদের ভাষা ও ভঙ্গী পাঠক ও শ্রোতার মানসলোক কণিকাকে উত্তেজনার উত্তপ্ত করে ভ্রমবাহন মাটির ঘরের মতো শূন্যগত রিক্ততা পরিবেশ করে মাত্র। বিশেষ করে শেষের বাক্য তিনটি মেন শালগ্রামের শোয়া আর বসার পার্থক্য নিরূপণের হাস্যানুপ প্রদর্শনকারী। এবার দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিত সংস্করণে আসা যাক।

মধ্যযুগের সাহিত্যসাধে আশ্রমসমীহার পূর্ণাঙ্গ নৈনা চোরাবালির আবেশে ধ্রুপদী প্রত্যয়ে অতিবাহিত। 'গাওঁন অব' এপিকউবিসাসের মত প্রতিবাদ 'সোলাসের' বার্কোর উত্তেজিত স্পর্ধা যথোচিত উত্তর না দিলেও বৃহস্পতি-নাগার্জনের উদরস্তার নীতি তাকে স্বাগত জানাতে সৃষ্টিত হয় নি। তাই আমাদের গণমাণ্ডিকার আত্মকীরণ ডনভলগার তারকতী মেঠো লোকদের পক্ষে অসম্ভব হয় নি। এমসনি যেখানে আত্মপ্রত্যয়ের ব্যাখ্যা বিশ্বাগ্রস্ত, হাস্যলোভে যেখানে প্রোভাষার জিহ্বাসংসার প্রয়োচনার অভিজুত-উত্তরের 'তবুর্মসি' সেখানে অবশ্যই প্রতিকারের পথ খোঁজে শাস্ত্রের মায়ার প্রতিকল্লতার। গাটের জগৎ ছায়াময় ছিল কিনা বলা কঠিন, অন্ততঃ ফাউসের অজ্ঞায় ছায়া-কায়ার পরপরের কর্ম-মর্মন দৃঢ়তর করেছে বলতে পারি। আবার ওনিকে দেবদ্বি দান্দের ছায়ার মানবিক আবার। তবে সেকসপিয়র যে ছায়াকে কামারপে জীলন্ত করেছিলেন ডানকানের মৃত্যুবাসরে, তা এক প্রভাষাতীত বিষয়। কথটা একটু, পরিষ্কার করেই বলাই—কালিদাস মলিনাথের জন্মকে তরাসিত করেছিলেন, যেনন বান্দ্যকী কৃত্তবাসরে জন্মের জন্য দাবিয়ার।

ওপরের বর্ণনায় উৎকর্ষিত কেরব-সম্বন্ধ পণ্ডিত ভগ্নতার একটি কলমায় চিত্র। এই রচনাটির প্রতি পঠিত্বতে অসার ভাব-বস্তুর যে-সব পায়াজারি ও গুরুদ্বাক ধ্রুববাদ বসান সাধা হয়েছে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিসের ছাদের উপযোগী একটি ধারী বিশেষ। এ ধরনের কোনও লেখা কোনও সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠার ছাপার হরণে শোভা পেলে তাকে বাহ্যক দেশের লোক কিছু অবশ্যই মিলবে—কি এই একটা বৈশ্বধর্মাত্ত সমালোচনাও হয়ত প্রকাশিত হয়ে যাবে। এ-ধরনের বাগাড়ম্বরকেই স্বয়ং কবিগুরু বলছেন—ইং টিট্—এ গ্যাডারি ব্যাখ্যা। আর দিগ-পঞ্জি ভাষায় একে কথা যায় পণ্ডিতমনাতার স্পেলোরো। এই ধরনের স্পেলোরার উপচিত সভ্যতার আয়োজনের স্বারা ভাষা বা সাহিত্যের বিন্দুমাত্র শ্রীশ্রী হয় না। তাঁদের জাহাজি বিদ্যা জ্ঞানার্ণবের সাগর পারাপার করতে ব্যয়িত হলেই অর্থক হয়।

সূচিকবসক সমাজ ও জাতির সেবা কতে অবশ্যই পারেন। কিন্তু সেজনা শাসন কতে সর্ম্ম কিনা বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। যিনি চিরদিন অনরারি প্রেসিডেন্ট হয়েও খেলার জগতে সর্ম্মিক পরিচিতি হয়েছেন, তিনি ইচ্ছা করলেই বোধহয় খেলালাড় হতে পারেন না। তর্জনি বিশ্ববিদ্যালয়ী বিদ্যার শ্রেষ্ঠ চাপরাশ পেলেই তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন এমন কোনও আশ্বাস নেই। তিনি জ্ঞানের সাধনা করতে পারেন, সাহিত্যের শৌর্যহিত্য কিছুতেই নয়। এ-

সমস্ত পণ্ডিতমনাতার অসুখির জন্য সাহিত্যের এক বিরাত ক্ষেত্র জনসাধারণের চিত্র থেকে অপসারিত। পাঠকদের মৃদু অভিযোগের যথোচিত মর্বাদী দিতে সাহিত্যব্যবসায়ীগণও বোধ করি কিছুটা কুণ্ঠিত। এ যেন কতকটা বিশ্ববিদ্যালয়েরও পদ পাকা করা আবার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির সভায় ও আইন সমসে স্থায়ী আসন দাবি করা। তাই বড় দুঃখে মোহিতলাল বলেছিলেন,—“পাণ্ডিত্যই সাহিত্যের জাতি-শত্রু”।

সাহিত্যক্ষেত্রে এই ধরনের রকমারি বন্যাবিসারের ফলে বৃদ্ধিজন্যের চিত্রাকল্পে অশ্বাত্তিক রূপে শিথিল হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে যাদের মানসিক গ্রহণশক্তি ও মেধা সবে মাত্র হস্তান্তর ভাষার সঙ্গে পরিচিত হতে সমুৎসুক, সে সব প্রতিভাবান ছাত্র সম্প্রদায় ও উদীয়মান লেখকবৃন্দ ক্রমেই এক আত্মঘাতী বিপ্লবিতর বন্দুধ্বনি হচ্ছেন। অশ্বা আকপ্রভাবনাতেই যারা আত্মপ্রসাদ ও গতিতেই যারা উন্নতি মনে করেন তাঁদের ভাষা হয়ত অনারকম।

উপরোক্ত মহাম শ্রেণীগণ আরও ক্ষতিকর প্রয়াস করছেন। তারা পাণ্ডিত্যের উদ্ভাস আশ্বাস বা সমীহ করতে সর্ম্ম হলেও গদ্যারতির উচ্ছ্বাসিত যাদুকরী বাজনার স্বারা পাঠকের গ্রহণ ও বোধশক্তিকে ক্ষুদ্রণ করার সহায়ক না হয়ে স্তম্ভন করেই রাখছেন মাত্র। প্রেক্ষাগৃহের আবহ যন্ত্র-সম্পত্তির একতানের প্রশমভাষনে কক্ষার বাস্তবিকই মনকে মূগ্ধ করে। সময়ে হয়তো কিছুক্ষণের জন্য মাতিয়েও রাখে। কিন্তু তার স্বারা কোনও বিশিষ্ট যন্ত্রের স্বাভাব্য বা কোনও সুরের স্বকীয় মাধুর্য্য অনুভূত হয় না। এজন্যই দেখা যায় গভীর অনুভূতির বাজনার সমবেত ভাবে নয়, এককসঙ্গেই পরিবেশ অনুসারে বেহেলা বা গীটারের সার্বক মূছনা। পদ্য গীতিতে ঘাই কি, গদ্য-পন্থাতিতে অবশ্যই ভাবের স্ফুজতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা কামা। রচনাকারীর যদি কিছু, বলবার থাকে তো পাঠকে সেজনা উল্লসিত। পাঠকে তিনি কথার হেরফেরের গোলক-খাধার বন্দী করে, ধ্রুমেসেবার আত্মপ্তির উদগীরণ-উচ্ছ্বাসের কুয়াসাজলে গা-ঢাকা দিয়ে, মূর্ত্তিক হাসেন। এটা যাদুকরী প্রয়াস হতে পারে, সাহিত্যের সেবা কখনই নয়।

কথা-সাহিত্যের পটভূমিকার অবতারণার কিবা ক্ষেত্র বিশেষে, ইমেজের চিত্রাঙ্কনে কল্পনাপ্রবণ রোমান্টিকধর্মী রচনাশৈলী মোটেই দেয়াবহ নয়। বরং মনোমীক্ষণের ক্ষেত্রে, স্মার-বিক-উত্তেজনার প্রাক-মুহুর্তে শব্দসম্ভারের কাব্যক স্রোতনা ভাবের পারস্পর্য্য ক্ষমতা করার বাস্তবিকই দ্বন্দ্বগ্রাহ্য হয়। সেই সব পরিবেশে পান, কুইকস, পেরিগ্রেসিস, উইট ইত্যাদির চাঞ্চল্যপূর্ণ সমন্বয় একসুপ অপরিসীমই বলা চলে। কিন্তু সল্লাগের পর্যায়ে এ-ধরনের বাক-বিদ্যা বিয়বরক্তুকে স্পষ্ট না করে, খোঁচাতে বাক-বিকতার মূল প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার, সলা-রনী বৃত্তিকে আশ্রয় করার, সাহিত্যিক স্বধর্ম্মচ্যুত হন।

কথা-সাহিত্যের রচনায় ওই সব ঐশ্বর্য্যালব্ধ টেন্দুশা যেতোটা সৃষ্টি না করে, তার চেয়ে অধিক অনিষ্ট করে প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও ভাবকৃমিও সাহিত্যকৃতির মাধ্যমে। কারণ ধীর চিত্তে প্রাণধান করলে এটাই সঙ্গত বোধ হয়, কাব্য ও কথা সাহিত্য (লেখা সাহিত্য?) মূলক রম্যচর্চায় শিক্ষা বিস্তারের চেয়ে নির্দোষ আনন্দ ও হ্রা মনোবিনোদেরই উপকরণ জোগায়। বৃদ্ধিবির্ভার ইংখ অনুশীলন কিছু হলেও উচ্চতরের মননশীলতা অন্ততঃ আধুনিক বাল্যে রচনায় স্বেচ্ছতর নয়। দুঃখের কথা হলেও এ-অপ্রিয় সত্য স্বীকার, করতেই হয়,—বাঁকম-বর্ণাশ্র-শরির প্রমথের উত্তর-কালীন সাহিত্যিক ঐতিহ্য, ভাব ও রচনাশর্ম্মের দিক থেকে আমরা রক্ষা করতে পারিনি। কাজেই গভীরতর ভাব ও বিস্তার প্রাজ্ঞ বিন্যাস-পন্থতি যা প্রবন্ধ সাহিত্যের আবশ্যিক চর্ম্ম এবং যা এখনও স্পষ্ট কিছু অবশিষ্ট আছে, তার ভাঙনের দিকে আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আরোপ করা জাতীয় কর্তব্য।



একটি কথা এ প্রসঙ্গে অবশ্যই পরিষ্কার করে বলা দরকার। বাকুডগ্গার ধোয়টেননা সম্বন্ধেই আমাদের অভিযোগ দৃঢ়তর। ধর্ম-নাথানা ও অনুপ্রাসের লালিত্য, যাকে একাধিকবার কাব্যধর্মী গদ্যায়ন বলাই, তা বিষয়বস্তুর বিশেষণকে অতিক্রম না করলে উপেক্ষণীয় নয়, যদিও অত্যাবশ্যকীয় নয়।

গদ্য রচনার এই আলঙ্কারিক পন্থাতি বাংলা সাহিত্যের আসরে সর্বপ্রথম আমদানি করলেন স্বর্গের কবিগুরু। কেউ কেউ অবশ্য এই কৃতিত্বের জন্য প্রথম চৌধুরী ও 'সবুজ' গোষ্ঠীকেই চিহ্নিত করেছেন। এটা আপাতঃ দৃশ্যমান সত্য হলেও ঐতিহাসিক সত্য নয়। কবিগুরু অবশ্য পাশ্চাত্য রূপকথার ওয়াইল্ড রীতি তার অপরায়ে প্রভাবের স্বারা আচ্ছন্ন করে নিজেছিলেন। তাই অনুকারের মস্তুরাকে তিনি শাস্তিপূর্ণ মিঠে শব্দায় পাক দিয়ে আচঙালকে মুগ্ধ করলেন। যিনি অপরূপ মনীষার পঞ্চদশীপ হতে বারি পুঙ্খের যোজ্যপাচার নিয়েই আবিস্কৃত হয়েছিলেন কাব্য ও সঙ্গীতের নব কলবের রূপ দিতে, সেই ছান্দসিক গুরুর লেখারূপ সঙ্গীতময় হওয়াই স্বাভাবিক। তথাপি এ-প্রসঙ্গে বলতে শিখা নেই যে, তখনকার দিক্‌পাল সমালোচকগণও একথা আমতা-আমতা করে বলেছেন যে, তাঁর নব্য গদ্যরীতিতে চিহ্নিত প্রবন্ধসমূহের ভাব-বস্তু অশেষমতে দিশেহারা হয়ে যেতে হয় কথা ও সূত্রের ইন্দ্রজালে।

তবে, তথাকথিত আধুনিক অনুকরণকারীদের ও কবিগুরুর মৌলিক গদ্য রচনায় মূল তফাৎ এই যে, প্রথমেদগ্গার রচনায় উচ্ছ্বাসের কুজ্জ্বলিতা ও পদবিন্যাসের ভেলকিই ভূরি পরিমাণ আছে, পশ্চাতে সারবস্তু প্রায়ই খুঁজে পাওয়া যায় না। আর শেষোক্ত জনের সৃষ্টিতে স-র-গ-মের স্বাক্ষর ধাত্ত্ব করে নিতে পারলে বিষয়বস্তুর অফুরন্ত ভাণ্ডার আবিষ্কার করাও ক্ষেত্র বিশেষে অসম্ভব নয়। কাজেই অধিকার-ভেদ না মানলে অতিরিক্ত আত্মশ্লাঘাই আত্মনাশের—তথা সাহিত্য-সম্মতির কারণ হতে পারে।

এবার এক বিশেষ ধরণের কথা বলছি। এঁদের ধর্ম-নাথানার বলাই নেই, যত-তত বিশ্ব-কালের শাসন নেই, পদে পদে এলুশন-কেশেশেনের বাড়াবড়াই নেই। এঁদের পুঁজি স্বল্প হলেও অধিকতর বলে মনে হয়। অর্থাৎ প্রায় একই ধরণের শব্দ সমষ্টিরকে পেরিফ্রেসিস পন্থাতিতে পরিবেশন করেই এরা নিজেদের কৃতার্থ করেন। এ-প্রশ্নটির শাব্দিক কারিগরেরা তাদের অজ্ঞাত-সারেই বরষকী মস্তে দীক্ষা নিয়েছেন। তবে দুঃখের কথা, সে-মহান সৃষ্টিকলা যেভাবে চিত্রিত ও অধ্যায়ন না পারিয়েই নেহাৎ কাঁচা ও কথায় অবশ্যই তাঁরা উদ্বন্ধ করছেন ও করাচ্ছেন, তাত্ত আশঙ্কা হয়, গুরুর পরিচিতি শিযোরা উঁকার বজ্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত না করান। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আমরা দেখছি, ফরাসী জাতীয়চরিত্রে সংঘর্ষের প্রাচুর্য কিছুটা কম। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তাদের সাহিত্য এই অগবদ যথেষ্ট স্থানলব্ধ করেছে। বাংলার পলিতে সেই চননভঙ্গী বীরবলই সাধুর্কভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। ঈদুকো কথার সহজ বাক্‌নিপ্পান্তিতে কিভাবে গভীর তত্ত্বেরও সূচন্য স্বরূপ হওয়া সম্ভব সে-শিক্ষা আমাদের আবার নুতন করে নেওয়া প্রয়োজন বীরবলী রীতি অনুসরণ করে।

যুগের গতিতে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু সেজন্য প্রগতির মন্ততাকও আমরা হুনিশ করতে চাই না। নিছক যুগের প্রতিযোগিতার বড়াই করেই উল্কা জ্যোতিষ্কের দাবি স্বীকার করতে চাইলেও নভোমণ্ডলে তার স্থান নেই। মৃতের মৃতের যাদুঘরেই সে কালে ওয়ে আমাদের কৌতুহলের খোরাক যুগিয়ে থাকে। যারা বলেন—সাহিত্যের সামাজিক দাবি ও কর্তব্য মুখা নয়, জ্ঞান পরিবেষণও এর বৃত্তি নয়, জনশিক্ষার বাহন হতেও সাহিত্য অস্বীকৃত—আট ফর আট স্‌সেক, তাঁদেরও কিছু অনুদান করার আছে বই কি!

স্বীকার করলাম, নিছক চিত্তবিনোদনেই সাহিত্যের আবেদন অবাসিত—ভাববিলাসের মৌততেই এর সার্থকতা পরিম্বষ্ট। তথাপি বলবো, সে আটকেও হৃদয় বাচাই করে নেয়, মস্তিস্কেরই মাধ্যমে। তাই চিন্তাকেন্দ্রের যথোচিত ব্যায়াম না হলে পরবর্তী যুগে ভাবের দৈন্য বাড়তির পথেই পা বাড়াবে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিহীন চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে আমরা আজ সৃষ্টির প্রাচুর্যেই আনন্দে আত্মহারা, উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিবেচনার অবসর বোধ করি আজ আর আমাদের নেই। ফলে এ-আশঙ্কা হয়ত অমূলক নয় যে, অচিরেই জাতির মানস-ক্ষেত্র অসার বায়ুভিড় স্বতপে চাপা পড়ে পরিণতের আত্নানন্দ শূন্য করবে। প্রবন্ধকারদের এ-বিষয়ের দায়িত্ব অত্যধিক হলেও কথা-সাহিত্যিকদের যুগোচিত জনপ্রিয়তার প্রভাব তাদের উপর অজ্ঞাতসারেই নীরবে কাজ করছে। কাজেই কালের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে প্রকরাব্রতের কথা-সাহিত্যের রচনাদর্শই জনগণের ভাবপ্রকাশের দিশারি বলে গণ্য হবে।

এই বাক্-সর্বস্ব ধোয়টো রীতি পাঠকের তথা সমগ্র জনসাধারণের ধীকেন্দ্রের স্বাধীনতা আনতে সহায়তা করছে। তাই আজ লক্ষ্য করছি, কেউ কেউ মৌলিক চিন্তার রিক্ততা গোপন করার অশোভন চাপলো একাধারে দুর্বোধ্য পিণ্ডতম্নতা, অপরদিকে সৃষ্টি-কেন্দ্রের ভূরি ভূরি হোয়ালি তৈরী করছেন সমালোচনা নামায়ে অজস্র টীকা-টিপ্পানীর মাধ্যমে। এর ফলে, ক্ষেত্র বিশেষে অনিপুণ শ্রুতি তার দীন সৃষ্টির সালস্বাক-সুশোভিত-মুদ্রিত অবয়ব নিরীক্ষণ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। পক্ষান্তরে ধীমান কৃতী কারিগর তাঁর স্বয়ংস্বিক্ত দীপ্ত মূর্ত্যাবলকে অঙ্গগুরীসুলভ আনন্দেও অপব্যায়ানে অন্তরে যথার্থ ব্যাখ্যাত হন। আর এই পক্ষপাতদৃষ্টি চোচা-কেন্দ্রা ও সমালোচনাবল্লভের মাঝখানে অসহায় বোধ করে জনসাধারণ শূন্যমাত্র বিভ্রান্তিই আহরণ করেন।

সাহিত্যসেবীরা বিশেষ করে চিন্তাশীল সৃষ্টিবল্লেরা, তাঁরা যেন বাংলা সাহিত্যের বাচনাবিন্যাসের গতি-প্রকৃতি ধীরভাবে লক্ষ্য করে তার পরিণতি হৃদয়গম্য করতে প্রয়াসী হন। অপেশোকার ও অর্থপেশোকার সাহিত্যিকদের এ বিষয়ে দায়িত্ব আরও বেশী। কারণ সাহিত্যিকৃতিই তাদের প্রাজ্ঞানদের একমাত্র অবলম্বন না হওয়ায় তাঁরা নৈতিক কর্তব্যের পরিচয় দিতে অধিকতর সক্ষম—অবশ্য সন্তা জনপ্রিয়তাই যদি তাদের প্রধানতম লক্ষ্য হয়ে না থাকে।



## সাম্রাট

### চিন্তামণি কর

#### চীনা ছাত্র

তিন সপ্তাহের উপর এতদূর চীনা ছাত্র-ছাত্রীদের সামিথো থেকে দেখলাম যে সহজ মেলাশোর কোন সম্ভবনা নেই। আশ্চর্যকরত পৌঁছাত কেবল একটা আতঙ্ক বিনয় ও ভয় সম্ভাষণ পর্যন্ত, যেন আমাদের মধ্যে থাকত একটা অদৃশ্য চারিফ ওয়ালের বাধা। এর জন্য আমার অনুযোগ করার কিছু নেই কারণ এটা তাদের জাতীয় চরিত্র এবং গড়ে উঠেছে বহু শতাব্দীর ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে।

ভৌগোলিক পরিবেশ ও ঐতিহাসিক ঘটনাচক্র নিয়ন্ত্রিত ও তৈরি করে দেয় প্রত্যেক জাতির সম্মুখিত স্বভাবকে এবং একই ঘটনার পড়লে বিভিন্ন জাতির প্রতিভার ফল হয়ে দাঁড়ায় রকমারি। বৈদিক যুগের ভারতের চারি বর্ণের মত প্রাচীন চীনেও ছিল চারিটি শ্রেণী। বিদ্যমঞ্জরী ছিল সর্বোচ্চ এবং তার নীচের স্থান ছিল যথাক্রমে কৃষকদের, কারিগর ও বাবসারীদের। ভারতের সমাজের এই শ্রেণী বিভাগ যেমন পরে বংশজাত জাতির সংস্কারে পড়ে গিয়েছে, চীনে এই শ্রেণীবিভাগ কিন্তু সে অবস্থায় পড়ে যায় নি। চীনে প্রত্যেক শ্রেণীগত ব্যক্তিদের বংশধরদের ইচ্ছামত পেশা নিয়ে সমাজের এই চারিবিভাগের পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় কোনদিন কোন বাধা হয়নি। এই কারণে সমাজে পেশা অনুযায়ী বংশগতভাবে কেউ উচ্চ বা খাটো হয়ে যায়নি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন চীনে প্রায় বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্র ও প্রতীক ছিলেন সম্রাট এবং সামরিক শক্তি স্ফীত হলেই এই সম্রাটরা আশেপাশের রাজ্যকে পরাভূত ও কলগত করার আয়োজন ও অভিযান করতেন। জিতগতভাবে নিজেরা শ্রেষ্ঠ এই রাজ্য চীনাঙ্গের মধ্যে গড়ে উঠেছে বহুকাল ধরে এবং তাদের চোখে বিদেশীরা চিরকাল পরাজিত না হলেও বিজিত ও সম্মানে অসমকক্ষ হিসাবে গণ্য হয়েছেন। চীনাঙ্গের ধর্ম সম্পর্কে কোনরকম গোড়ামি না থাকায় খৃষ্টিয় ধর্ম-পরিভ্রাটকরা প্রথমে চীনে আসল ধর্ম প্রচারে বিশেষ বাধা পাননি। কিন্তু সম্মানে সম্রাট ও পোপের মধ্যে শ্রেণ্য নিয়ে এবং বৈদিক প্রাচীন ধর্মাবতারদের ও খৃষ্টিয় সেণ্ট এপলস্‌দের গুরু লঘু, তুলনা নিয়ে লেগে যায় গোলমাল। মিশনারীদের পদানুসরণ করে ধ্রুমে আসে ইউরোপীয় বণিককূল।

সপ্তদশশতাব্দীতে মাছুংশ মিং বংশীয় সম্রাটের হাত থেকে সিংহাসন কেড়ে নেয়। এই বংশে জনতিনেক সম্রাট দৃঢ়মুখ শক্তিতে রাজত্ব চালাবার পর এই মাছুং শক্তিও নিস্বেজ হয়ে পড়ে। যেন উপযুক্ত সময় বুকে এই সময় আসতে আরম্ভ করে ইউরোপীয় বণিকদের জাহাজগুলি। ইয়োয়োপে ইনভিস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন্ শুরূ হওয়ায় প্রচা থেকে কাঁচা মাল আহরণে তথ্যরা তৈরী পণ্যসামগ্রীকে আবার প্রাক্তর দেশে পাঠিয়ে বিক্রি করে সহজে অর্থোপার্জনের গঁড় পাশ্চাত্যের বাবসারীদের প্রলুপ্ত করাইল। তদানিন্তন মাছুং সম্রাট বিশেষা বণিকদের কেবল একটা মাত্র বন্দরে বাণিজ্য করার অনুজ্ঞা দিয়েছিলেন। সেখানে চীনাঙ্গ-চারীরা আগত বণিকদের হয়েজনে রুঢ় ব্যবহার করার তাদের রীতিমত মানহানি হ'ত। এমনকি চীনদেশে তৎকালীন রীতি অনুযায়ী ইউরোপীয়দের নিরুজ্জ্বল কোন চীনা শ্রমিক যদি আকস্মিক কোন দরখোস্তের প্রাণ হারাত তা হলে তার ক্ষতি পূরণে ইউরোপীয় বণিকদের একজনকে প্রাপদেও দাঁড়ত করা

হোত। বাণিজ্য ব্যবস্থার সুবিধা ও চীনাঙ্গের কাছে উপযুক্ত সম্মানজনক ব্যবহারের অনুরোধ জানিয়ে ইউরোপীয় রাজ্যপ্রতিনিধিরা যখন সরকারী প্রস্তাব চীনা সম্রাটের দরবারে পেশ করেন তিন ধরনে যেন যে এদের রাজস্বাবণ চীনা সম্রাটের দাপটে ভীত হয়ে আনুগত্যের বিশেষ সম্মান-ভিক্ষা করে অবেরন পাঠিয়েছেন। চীনাঙ্গের ইউরোপীয়দের প্রতি বিশেষ ঘনীভূত হয় আর একটি বিশেষ কারণে। এই বণিকরা চীনা-কা, সিল্ক ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ে ভারত থেকে আফিম আমদানী শুরূ করেছিলেন। ধ্রুমে রাজকর্মচারী, সৈন্যদল ও জনসাধারণকে এই বিষয়ব নেশা অক্ষম ও মেরুদণ্ডবিহীন করে ভুজ্জ্বলে দেখে চীনা সম্রাট কঠোরভাবে আফিম আমদানী বন্ধ করার আদেশ দেন। চীনাঙ্গাতি ও সৈন্যদল ততদিনের আফিমের আস্তে ব্যাপকভাবে অক্ষম হয়ে গেছে তার নিশ্চয়তা পাওয়ার ইউরোপীয় বণিকরা আপনাদের সেনাসামান্যত নিয়ে সমবেত ভাবে চীন আক্রমণ করেন। বলা বাহুল্য যে ধারাবাহিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত চীনা সামরিক শক্তির তখন এমন সামর্থ্য ছিল না যে এই আক্রমণকে সক্ষমভাবে প্রতিহত করে। সমগ্র দক্ষিণ চীন হস্তচ্যুত হবার ভয়ে চীনা সম্রাট সশর শক্তির প্রস্তাব করেন। নতুন চুক্তিতে বণিকরা রীতিমত লাভবান হন কারণ তারা বহু বন্দরে সহজে বাণিজ্য করার অধিকারলাভ করা ছাড়া দেশের অভ্যন্তরবর্তী সহরেও বাসনা করার সুবিধা নিয়ে নেন। চীনাঙ্গা এতদিন মনে করত যে তাদের সামরিক শক্তি বিদেশীদের কাছে অজয়। সে শক্তি এই বাস্তব পরিণতি দিয়ে প্রজাবর্ণের মনে সম্রাটের ক্ষমতা সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ বা সন্দেহ না জন্মায় তার উদ্দেশ্যে তদানিন্তন ভরূপ সম্রাট ও তার অভিভাবিকা রাজমাতা বিদেশীদের নিপাকাত করে দেবার বহু ফন্দি ও চক্কা করেন। কিন্তু তার ফল হয়ে দাঁড়ায় অতি শোচনীয়। এই সময়ে পূর্বের দশো বছরের তুলনায় চীনের লোকসংখ্যা ভেড়ে যায় প্রতি জনগণ। দেশের শস্য ও পণ্য উৎপাদন শক্তি সেই অনুপাতে বর্ধিত না হয়ে পূর্বোক্ত আয়ের কমে যাওয়ায় এক ভীষণ পরিস্থিতির সৃচনা হয়। রাজকর্মচারীরা এর ফলে হয়ে দাঁড়ায় অসাম, প্রজাউৎপীড়ক ও শোকে। রাজা শাসনে প্রচণ্ড অব্যবস্থা এসে পড়ায় নিরুদ্বাহ ও ক্ষিপ্ত জনগণের মধ্যে সুদৃষ্টি হতে থাকে নানান গুপ্ত সমিতি। এরা ও হোয়াইট লোটাং এর দলভুক্ত লোকেরা হামলা করে শাসককুলকে দৃঢ়স্বতায় ফেলোইল। দেশে শান্তি রক্ষার্থে অবস্থার ফেরে সম্রাট ও তার অনুচরবর্গ শেষে বিদেশী বণিকদের সৈন্যধর্মদগিকের সাহায্য করতে আহ্বান করেন। এই সময় জাপানের সঙ্গে চীনের ঝগড়া লেগে যায়। এর আগে বার কয়েক কোরিয়ার অধিকার নিয়ে এই দুই শক্তির বেশে যোরাপড়া হয়েছিল। জাপান ও চীনের মধ্যে যে যুদ্ধ লাপে তাতে চীনাঙ্গের দারুণ রকমের পরাজয় ঘটে। সম্মিতে চীনকে প্রভুত অর্থ ও ফরমোশা পৃথিবী জাপানের হাতে তুলে দিতে হয়। জাপানের কাছে পরাজয়ের পর দেশের নেতৃবর্গের মনে আর কোন সন্দেহ ছিল না যে চীনকে স্বাধীনভাবে নিজের পায়ের দর দিয়ে দাঁড়িতে হলে সামরিক শক্তিতে শিক্ত সেনাবাহিনী ও তাদের পরোয়া সাজ ও অস্ত্রশস্ত্র সব বললে ফেলতে হবে। পাশ্চাত্য দেশের বিদ্যা ও বিজ্ঞানে নিজস্বের নিপুণ করে তোলবার জন্য চীনা সরকার জাপান, মার্কিনদেশে ও ইউরোপে ছাত্রদের পাঠাতে লাগলেন দলে দলে।

একটা মত জানেয়ারের মাংসান্ধারনে বাগ্ন শকুনার যেমন তার উপর পড়ে ঝটাপটি লাগিয়ে দেয় তেমনি শক্তির ও অসহায় চীনের নানা এলাকা ছললেলে কামান্ত করতে শুরূ করে জার্মানী, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান ও রাশিয়া। জাপান চীন থেকে অর্থের ও রাজস্বের এক বিরাট অংশোভ্যত করার পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ অনুদ্রুপ ভাগ নিতে চেষ্টািত হলেন। এইভাবে চীন লেগেওয়ে, খনি ও বন্দরগুলি আপন সুবিধামত এই শক্তির বশত করে গিলেন। এই সময়ে চীনা নেতাদের



একজন দেশের শাসন পদ্ধতি, শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা পাশ্চাত্য প্রথা ও নীতি হিসাবে গড়ে তুলতে অগ্রসর হনেন। কিন্তু দেশের রক্ষণশীল লোকদের এটা খুব পছন্দ হয়নি। তবুও সম্রাট ও প্রবাসী রাজমাতার মধ্যে রাজ্য শাসনভারের অধিকার নিয়ে চলছিল প্রচণ্ড বন্দ্ব-ও শত্রুতা। রাজমাতা এই সংরক্ষণশীল দলের নেতৃবর্গকে প্রভাবান্বিত করে সম্রাটকে বন্দী করে তাদেরই হাতে তুলে দেন শাসনের ভার এবং এঁরা পরিবর্তনকামী যাদেরই সামনে পেয়েছিলেন তাদের দেশ-দ্রোহিতার অভিযোগ দিয়ে সশর নিপাত করে চলছিলেন। নানা দুশু সমিতির লোকেরা, দু'ভাড়া ও তাদের সঙ্গে একজোট হয়ে “বিদেশীর নিপাতে দেশরক্ষা বজায় থাক” রবে শব্দ করে দিল দেশব্যাপী এক নরমেধ যজ্ঞ। বিদেশীরা এদের নামকরণ করেছিলেন “বন্ডার”। ইউরোপীয় শাশ্বত আশ্রয় আপন আপন এলাকার আধিপত্য রক্ষা করতে নিজেরের সেনাবলে এই বন্ডার বিদেশীদের জাহাজে পাঠাতে আরম্ভ করলেন এবং ক্ষতিপূরণের দাবী মেনেতে চীনাদের আরো জমিজমা ও ধনরত্ন চলে গেল এঁদের করলে। দেশে পরিবর্তনকামীরা জাপান প্রভাগত হাজার হাজার চীনা ছাত্রদের দলভুক্ত করে ও প্রবাসী ধনী ও ব্যবসায়ী চীনাদের অর্থ সাহায্যে আরোজন করেন রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য বিরাট বিদ্রোহ। নাবালক শিশু সম্রাট ও রিজেন্ট এর পদাধিষ্ঠিত তার পিতার সহায়তা করে এমন কেউ আর না থাকায় তারা রাজতন্ত্র ছেড়ে দেন এবং সুনে ইয়াং নাম এর নেতৃত্বে চীনে প্রতিষ্ঠিত হয় রিপাবলিক। কিন্তু দেশের পশ্চিম অংশেই সগ্রামে লিপ্ত করান। কুওমিটাং দল এ সম্বন্ধে তাদের সমর্থন নেই জানিয়ে প্রতিবাদ করেন কিন্তু বলহীন দলের এই প্রতিবাদ উদ্ভীষ্ট হইয়াছিল। জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে জার্মানী আশ্রয় আদেয়ান। কুওমিটাং দল তেজস্বী সেনাধ্যক্ষ চাংকাইসেক এর নেতৃত্বে জাতীয় সত্তা ও অধিকারকে ফিরিয়ে আনছিলেন ধীরে ধীরে। জাপানকে চীনে অপরিণামী অধিকার ও প্রভাব বিস্তার করতে দেখে শঙ্কান্বিত হয়ে রাসিয়াও ম্যাংগোলিয়ায় আপন প্রভাব বিস্তারে এগিয়ে যায় এবং প্রতিষ্ঠিত করে কমিউনিজম এর কেন্দ্র। ক্রমে উত্তর পশ্চিম এলাকার চীনা কমিউনিস্ট জার্মান শক্তি ও চাংকাইসেক এর মধ্যে দেশশাসনভারের অধিকার নিয়ে লেগে যায় লড়াই। সুবিধাবাদী জাপান মাংগোলিয়া অধিকার করে চীনের অপর এলাকায় বাহ্য বিস্তার করছিল দ্রুতগতিতে। তার এই অন্যায় অভিযানের বিরুদ্ধে লীগ অব নেশনে প্রতিবাদ উত্থল জাপান লীগের সমসাময়িক্য করে নিজেকে আন্তর্জাতিক সব দায়িত্বমুক্ত ধরে নিয়ে আরো প্রবল আক্রমণ চালান চীনের বুকে। হাইয়ের শত্রুকে প্রতিহত ও পরাজিত করার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট নেতারা ও চাংকাইসেক এক চুক্তি করে সমবেতভাবে চালাছিলেন চীনে মুক্তির সগ্রাম এবং এই মতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এক-যোগে সারা চীনের ছাত্র ছাত্রীকূল। এই জাহাজের যাত্রী ছাত্রছাত্রীরা তারই একটা অভ্যুত্থান নন্দনা। এরা সর্বদাই একীভূত থেকে কখনও বা গাইত সমবেত কণ্ঠ জাতীয় সঙ্গীত কিংবা

উত্তেজনার সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করত অথবা জাহাজের এক-থেমেমী সময় কাটাতে খেলত মাছের। এদের মধ্যে দু'জনকে আমার বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে। এক-জনের নাম ছিল “হু”। ইনি এঞ্জিনিয়ারিং শিখেছেন এবং সেতু নির্মাণাদিতে বিশেষ পারদর্শী। নানা কথা প্রসঙ্গে একদিন তিনি বলেন “আমার নামের অর্থ হচ্ছে বাঘ। বাঘ যেমন থানা ভোবার বাঘা লাফিয়ে অতিক্রম করে পড়ে তার শীকারের উপর তেমনি আমার বানানো সেতুপুর্ল দিয়ে বহুতে নদী নালা উপকো আমাদের জাতীয় সেনারা জাপানী শত্রুর উপর পড়ে তাদের নিপাত করতে থাকবে।” বন্ধাম জাপানী সেনারাও তো আপনাকে কোনমতে বধ করে সে সম্ভাবনাকে শেষ করে দিতে পারে। তিনি হেসে বলেন “আরে তার আগে দেশেতে আমার জানা বিদ্যায় পার-দর্শী করে দেব আরো হাজার লোককে। জাপানীরা একটা হু-কে মেরে দেবে তার জায়গা নিতে দাঁড়িয়ে আছে আরো হাজার হু।”

চোরার বিশেষ্যে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত রূপ ছিল কু' চ্যাংচ্যাং এর। তাকে দেখলে মনে হত টাং যুগের একটি যোদ্ধামূর্তি যেন জীবিত হয়ে ডেকে ধরে বেড়াচ্ছে। চাং লু-ডন ইউনিভার্সিটিতে পলিটিকাল ইকনমিক্স এর পড়া শেষ করে দেশে ফিরছেন। এই ছিপছিপে গড়নের অতি দীর্ঘাকৃতি পুরুষের মধ্যে একটা অস্বস্ত আভিজাত্যের ছাপ সর্বদাই জ্বলজ্বল করত। এই একটি মাত্র চীনা যাত্রী যারা সাহচর্যে কোনদিক অন্বেষ করিনি সেই অদ্ভুত ব্যবস্থায় না অন্য ছাত্ররা আমাকে ভুলতে দিত না। চাংগের হাতে একটা বেশ মোটা ও অস্বস্ত ধরনের আংটি ছিল। সেটা যে অনেক পুরনো তা দেখলেই বোঝা যেত। একদিন এই আংটির মধ্যে কত জিজ্ঞাসা করতে চাং সেটি খুলে আমার হাতে দিলেন। দেখলাম তার একদিকে মীনাঙ্করা অপূর্ণ কারুকার্যের একটি সমুদ্র জ্ঞান। চাং জ্ঞানগের ছবিটি হাতের মথের দিকে ঘুরিয়ে লুকিয়ে রাখতেন। বন্ধাম জ্ঞান তো মিং রাজবংশের প্রতীক, আপনি এত সুন্দর অলঙ্কারটা লুকিয়ে রাখেন কেন?” তিনি একটা বিষাদ হাসি হেসে বলেন “ঠিকই বন্ধাম। এ আংটি আমার কাছে কেবল একটা অ্যাংটিক সংগ্রহ নয়। এ আমার পূর্বপুরুষের বংশগতধন এখন অতীতের একটা অস্পষ্ট স্মৃতিমাত্র। এক এক সময় ভাবি কি হবে এক আটকে রেখে, সাগরের জলে ফেলে লুপ্ত করে দিই আমার পূর্বপুরুষদের মত এরও অস্বস্তিক। তাদের স্মৃতি আজকের আধুনিক চীনে অব্যাহত, বিশেষ করে যখন সম্রাটের উত্তি প্রত্যেক চীনার মনে আজ কেবল ঘৃণা ও অবজ্ঞাই জাগিয়ে তোলে। তাই সর্বস্বের চোখ থেকে জ্ঞানকে থেকে লুকিয়ে রাখি অতীতের ও আমার যুক্ত একটা অভিজ্ঞান। আজকে ইতিহাসে আমার পূর্ব পুরুষের স্থান লুপ্ত হয়ে গেলেও আমারই মধ্যে তারা এখনও জীবিত এবং তাদের স্বরূপকে আমি দেখতে পাই এই আংটিরই মত স্পর্শে।

কে জানে মিং রাজবংশীয় চাং ও তার স্মৃতিভরা আংটি ঘটনাচক্রে চীনের জাতীয়-সগ্রামে আজ হয়ত খেলায় মিশে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে কিংবা বিশাল চীনের কোন ভূখণ্ডে জীবিত তিনি এখনো স্থান দেখেন আংটির মাধ্যমে পূর্বপুরুষদের গৌরবময় কোন সুদূর অতীতের।







শ্লথ, সহজ ও আনুসঙ্গিকস্টিকিটেজ জীবন-বোধের পরিচয় পাওয়া আশ্চর্য নয়। কোন সাহসী সমালোচক অধিক অগ্রসর হয়ে অনুসন্ধান করলে এমনটি লিপ্যে মত শূন্যস্থত, ওভিদের মত অকপট প্রতারণী কিম্বা চমারের মত ভীষণধর্মী কবির রচনাতো ও অস্পষ্টবস্তুর অশালীনতা আবিষ্কার করেছে। গ্রীক ট্রাজেডির মতুইহান রাজা সফোক্রেসও আধুনিক রুচিতে যদি দূরসাহসী ও অসামাজিক প্রতিপন্ন হন তাহলেও বিশ্বাস্য হবার কিছু নেই। নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধ ব্যাখ্যানে দণ্ডী, কালিদাস, জয়দেব খোলাখোলা ভাবে এবং জয়ের সঙ্গে সে যুগে যে সমস্ত কথা লিখতে পেরেছিলেন সেগুলি অধিকাংশও অনুশূচ্য কারণেই বর্তমানের রুচিতে অপাণ্ডেয় শব্দ নয় ন্যাকার জনক মনে হতে পারে। অথচ সেগুলির অনাদর সেযুগে ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যে বরং এই তথাকথিত কামরূপতাকে রস সৃষ্টির সহপাণী বলেই গণ্য করা হতো। সেকালের অলংকার শাস্ত্রে তাই দেখা যায় যে নারীকে সকার্ষণেই কাব্যচর্চা থেকে বিরত থাকবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সমালোচকেরা অন্তত জন্মগত সংস্কারের বলেও জানতেন যে পদ্যবৈরাগ্যে কানে পদ্য, যা নিঃসন্দেহে নিবেদন কোবেলে পারে নারীর সহাবস্থিতিতে তা অসম্ভব। এবং কবিদেরও একথা অজানা ছিল না। তাই তারা পাঠিকার পরিবর্তে পাঠক-সাধারণকেই প্রমোদিত করবে সম্বোধন কোরতেন অকুণ্ঠার সঙ্গে। পাঠিকার স্থান তাঁদের কাছে অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত ছিল। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রেও দেখা যায় যে অশ্লীলতাকে নীতিগত কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি; বরং কাব্যে সুনীতি প্রচারের চেয়ে সুচরিত্র প্রসারের উপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। শব্দে তাই নয়, কবি এবং পাঠক নির্বিশেষে সে যুগে সবাই মনে করতেন যে যা সত্য, যা শারীর বিধির অঙ্গ, যা একান্তই স্বাভাবিক তা অশ্লীল হয়েই পারে না। বরং যা স্বভাব-ধর্ম তা প্রকাশ করাই বাঞ্ছনীয়। যে তত্ত্ব সর্বজনবিদিত তাকে অকারণ কৌতুহল জাগিয়ে গোপন করার মধ্যেও তারা কোন সার্থকতা খুঁজে পেতেন না।

এবংই প্রত্যয়ের উত্তরাধিকার উনিবিংশ শতাব্দীর ইউরোপেও দেখা গিয়েছিল। সে যুগে ফরাসী তেজস্বিনী শুল্লের চরিত্র, জোলা, আনতোল দ্রাস প্রভৃতিও কিয়দংশে এই মত পোষণ করেছেন। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বরং রোমাণ্টিক বাস্তববাদী ও প্রতীকী কবি শাল বোলদোর-র্যাভে-লমফর্গুভেলো এই আদর্শের কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন। সমাজের সর্বস্তরের নর-নারী সম্বন্ধে নিগূঢ় অব্যয়্যার প্যারীর সমস্ত পঞ্জী ছিল তাঁদের নন্দনপল্লি। এবং সেই সব দেখে ও মনে অকপট সত্যভাবকেই তারা সার মনেছিলেন। হেন বিষয় ছিল না যা তারা না আশ্বাসন করতেন। এবং হেন বস্তু ছিল না যা তারা কাব্যে স্থান দেননি। তাঁদের সেই সব বিবরণ ও প্রতিবেদনের মধ্যেও কিছু কিছু দূরসাহসী, অশালীন অংশ বিরাজিত নয়। কিন্তু এই বাহ্য আবেগ বহু আর। এতেও পূর্ব-প্রত্যয়ের অবিকৃত রূপ বিদ্যত নয়। বরং আধুনিক ইতালীয় রিয়ালিজম এবং ফরাসী অস্তিত্ববাদে এই ধারার ইম্বয় স্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে উনিবিংশ শতাব্দীর প্রকৃতিবাদীরা সমাজের অন্তর্গত নানা ব্যক্তি-চারিত্র তার স্বরূপ উন্মোচনের উপরেই বেশী জোর দিয়েছিলেন। তাঁদের লেখায় যে অনুত ভাষণ ছিল তাও ছিল আবেগ ও সমবেদনহীন। অনেকটা সমালোচনা মূলকও বটে।

রিয়ালিষ্টরা কিন্তু দোষে-দোষে, আলো-অন্ধকারে যে মানুষ তার ছবিই আঁকলেন। তারাও অবশ্য মানব প্রকৃতিতেই স্থান দিলেন সর্বোচ্চ। জীবনের সর্বক্ষেত্রে অভিব্যক্তিও অকুণ্ঠ প্রকাশ করলেন; তথাপি তাঁদের রচনায় সাদৃশ্য, শব্দক সত্যানুসঙ্গিকতার পরিবর্তে প্রথানত বাস্তব রসের দরদী সজ্ঞাই বড়ো হয়ে উঠলো। ইতিপূর্বে চেতনোন্মুক্ত দলেরই কোন কোন লেখকের লেখায় যে দাশনিকতা ও সহানুভূতি অকুরাবস্থায় বিরাজমান ছিল এরা

সেগুলি তো গ্রহণ করলেনই, সেই সঙ্গে মৌল্যসার অন্তর্দৃষ্টি, হৃদগোর জীবন-বোধ, ব্যালজ্যাকের কল্পনা শক্তি অথবা আনতোল দ্রাসের সরলতাও প্রতিবিশিত কোরলেন নিজেদের লেখায় এবং বিবি নানা জটিল বস্তুর সমীকরণে তাঁদের রচনামূর্ধেও দেখা দিল নানা বিভাজ্যতা। রম্য এই আন্দোলনের তরঙ্গ তাই বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে এর নব আন্দোলনেরও সূচনা কোরলো। একদল পদ্যরোম প্রকৃতি বাদই পদ্যরক্ষাশীল কোরলেন নবরূপে; তাদের মধ্যে আলফাস দোলে প্রকৃতির নাম উল্লেখ্য। আর একদল প্রচার কোরলেন অস্তিত্ববাদ। সে ভাব-ভবের কর্ণধার হলেন সত্যী, কামু, প্রকৃতিরা। তাঁদের পূর্বে যাদের নাম এই উজ্জ্বল দলের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে চিহ্নিত হয়েছিল সেই আন্দ্রে জীদ, গ্রাসোং দেলপ্লা প্রকৃতিরাও নবতন ধারার উৎস মূখ বলে ধরতে বিশ্বাস কোরলেন না। কিন্তু তাঁদের কথায় পূর্বে শেষ করে নেই রিয়ালিষ্টদের কথা। পূর্বেই বলছি রিয়ালিষ্টরা এক হিসাবে ছিলেন প্রকৃতিবাদীদেরই সমপোষ্য। তারা নিজেদের পরিচয় দিতেন নিও-রিয়ালিষ্ট বলে। নির্বাচনে সু এবং কুকে সমান মর্যাদায় চিহ্নিত করার মধ্যেই তারা আর্টের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন। এবং অতি সাধারণ ব্যক্তির অতি-অসামাজিক, ঘৃণ্য কার্যকলাপের মধ্যেও তারা খুঁজে পেতেন সাহিত্যের উপাদান।

অশ্লীল-সাহিত্যের নানা ধারার পূর্বাপর আলোচনা করলেও এখনও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে যথার্থ অশ্লীল কাকে বোলবো। আমরা জানি সাহিত্যের কাজ হচ্ছে সহস্র পাঠকের মানসিক আন্দল দেওয়া। একের আখ্যার সঙ্গে বহুর আখ্যার সেতুবন্ধ রচনা করা। আনন্দময় আত্মসম্মিতের আশ্বাদনের মধ্যেই সংস্কৃত আলংকারিকেরা তাই রস সৃষ্টির উৎস স্থাপন করেছেন। সাহিত্য-পাঠকের আনন্দ অবশ্য তাঁদের মতে বহুলাংশে নৈবাভিক, অমূর্ত বিষয়। ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির চরিতার্থতার সঙ্গে তার কোন সংযোগ নেই। কিন্তু যে সাহিত্য অশ্লীল, যে সাহিত্যে স্থূল রূচিবিকার সঞ্চারিত তাতে ইন্দ্রিয়গদূল সহজেই উত্তেজিত হয়। তখন নৈবাভিক অনুভূতির পরিবর্তে লালসা ও জগৎসার ভাব মনে জাগে এবং পাঠকের চিত্তবিকার ঘটে। শব্দে তাই নয়, সাহিত্য-করো যখন সুখময় পরিবর্তে নন্দনতাকে, মনো পরিবর্তে ইন্দ্রিয়কে, সু এর পরিবর্তে কু কে কিম্বা গোষ্ঠির কল্যাণের চেয়ে ব্যক্তির ক্ষণিক ইন্দ্রিয় পরিভূক্তিকেই অগ্রাধিকার দেন তখনও সাহিত্যে এই দোষ ঘটে থাকে। অবশ্য বলা বাহুল্য নন্দনত মাহই অশ্লীলতা নয়। কু-ইন্দ্রিয়ের উত্তেজিত নয় কিছু, নির্ভর করে উপপ্রায়ের তারতম্যের উপরেও। আলংকারিক যখন যদিও বলেছেন যে, যে-কাব্য নির্জনে বসে পাঠ করলেও মনে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ও অমল্লাশ-লক্ষা জাগ্রত হয় তাই অশ্লীল, কিন্তু বর্তমান যুগে সেই সংজ্ঞাই যথেষ্ট নয়। কারণ উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান যে মানবের রীরগণ্য ব্যক্তির কু-অঙ্গ ও অশ্লীলতার অন্যতম অঙ্গ। তাই এক কথায়, নৈবাভিক রস-চর্চায় পরিবর্তে যে সাহিত্য মানবের স্থূল কামোদ্দেশ্য চরিতার্থতার ইচ্ছা জোগায় তাই অশ্লীল। অবশ্য বাঁভঙ্গ ও লজ্জাক্ষর সাহিত্য এই জাতীয় বিষয়ের বাহিত্তিত নয়, তবে এটি পৃথক ভাবে উল্লেখের কারণ বর্তমানে প্রথমেই প্রশ্নের সাহিত্যিক বিকৃতিই অধিক দেখা যায়।

পূর্বেই বলছি সংস্কৃত সাহিত্যে অশ্লীলতাকে একটি প্রকরণগত দোষ বলেই বিবেচনা করা হত। আদি রসায়ক ও কামোদ্দেশ্যকারী প্রসঙ্গ মাহই তাই সে যুগে অশ্লীল ছিল না। প্রকাশ জগির স্বাধাই সে যুগে শ্লীলতার মান সর্বাপর্ণি ভাবে বিবেচনা চলেতো। এবং এখকার তুলনায় সত্যতন নীতিবোধ ও লজ্জাবোধের ধারণাও ছিল তখন অস্পষ্ট ও অস্পষ্টাকার। তাই গ্রাম্যতা বা ভালগারিটিকেই সে যুগে অশ্লীলতার মৌল লক্ষণ বলে গণ্য করা হত। অন্তত দণ্ডী পুথ্যেরা তাই করতেন।



আসলকথা অশ্লীলতা সংক্রান্ত এই ছদ্মবোধ্য বাস্তব সাহিত্যে ব্যাপকভাবে দেখা যায় উনিবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে। ইংরেজ সাহিত্যের আদর্শগত প্রভাবের ফলেই এই কাণ্ড ঘটেছিল। তৎপূর্বে সস্কৃত সাহিত্যের উত্তরাধিকারের এর চিত্রস্বভা ছিল না। ভিত্তিগিরি যুগের ইংরেজ সাহিত্যে যে সাপ্রেমশন ও কৃত্রিম শালীনতা রক্ষার চল হয়েছিল এই প্রতিজ্ঞা ছিল তাইই অনুসৃত। সেমগে মাখ্‌আর্শফট প্রমুখ ইংরেজ সমালোচক ও লেখকবৃন্দ মরাল সেন্সকেই এসম্পর্কিত ইমোশনের উদ্দেশ্য স্থান দিতেন। তাঁরা সৌন্দর্য চর্চার চেয়ে নীতির মান রক্ষাকেই ছিলেন অধিক নিয়োজিত। এবং সমাজের স্বাস্থ্যসংরক্ষার ব্যতীতে সে যুগের এই সমালোচকেরা মৌল সৌন্দর্য চেষ্টা ও মানব প্রকৃতির অন্তর্লীন স্বাধীনকে বর্জিত করেতেও বিন্দুও বোধ করেন না। ইংরেজদের অনুসরণে ক্যাঁটেনেটল সাহিত্যেও সমসাময়িক কালে এই নীতি বাণীশতা ক্রিয়বশে সঞ্চারিত হয়েছিল; তাই বাস্তবী লেখকেরাও যে ‘প্রভু-সাম্রাজ্য’ আদেশে অনুপ্রাণিত হবেন এতে আর আশ্চর্য কি?

অশ্লীলতার অভিযোগ, অতঃপর, কি ভাবে যে গ্রামাতার স্তর পেরিয়ে ক্রমশঃ আরো দৃঢ় নীতি ব্যুত্রে অগ্রসর পেল আশা করি জা উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে।

আজ থেকে দুশো বছর আগেও অশ্লীলতার এই ধারণাটি এত স্পষ্ট ও অবিকল ছিল না; বিবর্তন লক্ষ্য সূচীকৃত কৈন সংজ্ঞাও তখন চালাই হয়নি। দ্বন্দ্বের-অবমাননা, চাচ্‌কে অগ্রদূত, এমনকি রাজপুত্রের অবমাননাও তখন ছিল অশ্লীলতার গণ্ডীভূত। এবং সেকালে যে সব তুচ্ছ ও হাস্যকর কারণে একটি গ্রন্থ ও তার লেখককে নির্বাসিত ভোগ করতে হত বর্তমানে সে দৃষ্টান্ত একান্তই কৌতূহলজনক মনে হতে পারে। সাতের্শ-দশের ‘ডন কুইকসমোটের’ মধ্যে এখন আমরা নিদর্শন কিছুই পাইনা অথচ সামন্ততন্ত্রের প্রতি, বিশেষত নাইট-হুডের প্রতি সূক্ষ্ম বাগ্য থাকায় সেকালে বইটিকে যথেষ্ট কুৎসারী কুড়িতে হয়েছিল। পঞ্চদশের সে যুগে যা ছিল সহজ এবং তাঁক্ষ্য আবেদনময় একালে তারআবেদন বহুলংশে অপরিচিতকর বিবেচিত হতেও পারে। যেমন সফোক্রেসের বহু আলোচিত ষ্ট্রিপাস রেক্স; গ্রীক রাজপুত্রের ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের অবস্ভাবিক ও কদম্ব পরিণতি আমাদের সুলভ মনে নির্যাতন অনিবার্যতা মনে পড়বার আগেই অশ্লীলতার গণ্য ছড়ায়। ঠিক অনুসৃত কারণেই ইউলিপিসের প্রকৌতুক-নাট্য, কালিদাসের ‘শূন্যদার্ষিক্য’ ভারত চন্দ্রের ‘বিদ্যাসুন্দর’ বর্তমান মূর্খি ও নীতি বোধের বিচারে অপাঠ্য ঠেকতে পারে। আসলকথা যে যুগে নীতির পরিমাণ ভিন্ন মানদণ্ডে হত, রচিত বোধও বর্তমানের মত এত সূক্ষ্ম হয়ে ওঠেনি তাই তৎকালের সমালোচকেরা প্রিয় দৃষ্টান্তগতই এগুলিকে সার্বিক সাহিত্য সূচি বলে অভিনন্দিত করেছিল। কিন্তু এযুগের সংস্কার নিয়ে আমরা ঠিক এগুলিকে মেনে নিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে অশ্লীলতার আদর্শটি প্রত্যেক দেশের ঐতিহ্য, সমাজ রীতি, বাজ মানস, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিজ্ঞা প্রবণতার ধারনায়োই পরিবর্তনশীল। যে সমাজ মত দর্শনকাতর, লক্ষ্যশালী ও ঐতিহ্যপন তার নীতিবোধও ততদ্বীর্ণ ও অকুণ্ঠ। অপরপক্ষে লম্ব জীবন-বর্ধন, উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি ও ‘আনবারাসনেন্দ’ অশ্লীলতার সূত্র স্থান করে থাকে। ইংলেণ্ড ও ফ্রান্স যথাক্রমে উভয়ধারার সূত্র-উদাহরণ।

কোন দেশের কোন সমাজেই দূর্নীতির প্রত্যক্ষ অনুমোদন পাওয়া সুলভ নয়। কিন্তু পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া সহজ। অধুনা কতিপয় সুবিধাবাহী সমাজ নেতার সমাজ-নীতি পরিভাষে হওয়ায় সব দেশের সাহিত্যেই সেই অনুমোদনের ইঙ্গিত মিলেছে। তাছাড়া প্রচলিত মূল্যবোধে অবিবাস্য, যুগ্মপাতের অনিশ্চয়তা ও অবশেষ, সমাজের সর্বস্তরে প্রচণ্ড ভাগ্যন, সিংহ-সম্বন্ধের যথেষ্ট লম্ব লেখকদের দায়িত্বকে করে দিয়েছে আরো মসৃণ। সমাজপতিত বিধানের সঙ্গে

নীতির চলচর্য্য বিভাগও পরিভাষে হয়েছে সে সংগে। মূলত জন রুচি ও পাঠকের সংস্কারের ব্যত্যয় ঘটলেই আমরা শ্লীলতার প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকি। কারণ সাহিত্যের উৎকর্ষ, অপকর্ষ অনেকটা বিষয় নিরপেক্ষ। তাছাড়া অনুমোদনও আমাদের নীতিজ্ঞানের অপ্রত্যক পথ প্রদর্শক নয়। কারণ সমাজের বিধি নিষেধে যে নৈতিক প্রত্যয় প্রতিফলিত তা অনেকটা সুবিধাবাদ ও সংযোগ্যবিস্ত জনসাধারণের স্বার্থ সুরক্ষণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই নিষেধের অসাধারণ ব্যতিক্রম থাকাও অসম্ভব নয়। অসংযমবর্ণন্য হুমায়ুনকৃতীর তাঁর বিদ্রোহে আবার সে ব্যতিক্রম প্রায়ই যদি সাহিত্যে প্রকাশমান হয় তবে তাতেও আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

উনিবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক অস্কার ওয়াইল্ড তাঁর তথাকথিত ‘নিষিদ্ধ বই’ গৃহচর্চার অব ডোরিয়ান গ্রোস ভূমিকাতেও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। তিনি আকৃষ্ট নীতিবোধের মূলেই শব্দ কুঠারখাত করেননি শিপের অর্ন্তনিহিত স্বরূপও সেই সংগে করেছিলেন সুব্যাখ্যা। তাঁর মতে, কোন গ্রন্থই শ্লীল বা অশ্লীল হতে পারে না—হয় তা সুলীলিত নয় তা কুলীলিত। এ প্রসঙ্গে আমরা নন্দন তালুকদারও মতামত প্রদান করতে পারি। গ্রীষ্মবাসজীবন চৌধুরী তাঁর ‘সৌন্দর্যদর্শন’ বইটিতে ‘সুদ্রীতা ও কুদ্রীতা’র সূত্র ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন—‘সুদ্র-অসুদ্রের ভাবপ্রকাশের সাক্ষ্য-অসাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে। যেখানে ভাব নাই এবং প্রকাশও নাই, সেখানে সুদ্রও থাকিতে পারে না।... এই খানে আমরা অসুদ্রের কি, তাহারও বিচার করিতে পারি। অসুদ্রের বোধ তখনই আসে যখন কোন সংকেত—যেমন শব্দ, রেখা, রঙ ইত্যাদি কোন একটি ভাবকে প্রকাশ করিতে গিয়া অকৃতকার্য হয়। অর্থাৎ—অস্পষ্ট প্রকাশ বা প্রকাশের অক্ষম চেষ্টাই অসুদ্রের।’

কিন্তু সাহিত্যিক অশ্লীলনীতাকে এ্যাবস্ট্রেট সৌন্দর্য-চেষ্টার সংগে তুলনা করে একে-বারে প্রকরণ গত দেখা বলাও ঠিক নয়। কারণ বৈয়াক্য অশ্লীলতাও বর্তমানে সূত্রচর্য্য। আদি কমান্ডের কমান্ডেরকারী জীবন-বর্ণনা বা যৌন উপযোগের নন্দ বিবরণ যেমন অশ্লীলতার বহুল গ্রাহ্য উদাহরণ তেমনি মানুষের চৈতন্য-অবচেতন মনের গহনতম অংশস্থিত নানা যৌন কমান্ডেরকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনাও সমান অভিযোগের অত ভাগ। ফরাসী প্রকৃতিবাদীরা এংলোকাল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার আবেগপ্রবাহী বিচারকের মত মানুষের গোপনতম দৃষ্টান্তই অনুসন্ধান করে আসাছিলেন। কিন্তু ভিয়েনার চিকিৎসক সিগমন্ড ফ্রয়েড এই জাতীয় মামলী যৌনভিজ্ঞতার মূলে কুঠারখাত করলেন তাঁর মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতির আধিকারের সাহায্যে। উনিবিংশ শতকেই এই মত প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই তাঁর প্রতিজ্ঞা দেখা গেল কাব্য-গল্পে-উপন্যাসে। এমনকি নাটকেও। সভ্যতা ও সমাজ সূচ্য পারিবারিক বন্ধন সমূহও ফ্রয়েড অশ্লীলতার কারণলেন।

ফ্রয়েডের এই মত আধুনিক সাহিত্যিকদের শব্দ চর্চালিত কোরলো তাই নয় বিদ্রোহও করে তুললো। নিরাপেক্ষ মূলক ভাবে এই মতের প্রয়োগ শব্দ হয়ে গেল সাহিত্যের বহরতল। লেখকবৃন্দও গোষ্ঠীর মনোরঞ্জনাকাংখা পরিভাগ করে আঁক কোঁক, (ego centric) অসলম্বন অসুস্থ যৌন চিন্তাকেই করে তুললেন তাঁদের লেখার নিভর। এই সময় জন্ম নিল চৈতন্য স্রোত মূলক উপন্যাস। মানুষের চৈতন্য, অবচেতন এমনকি অচেতন মনের নানা চিন্তা ও ইন্দ্রিয়ের নানা বিচার ও তাঁর অনুভব খোলাখলি ভাবেই এই জাতীয় গ্রন্থে বিবৃত হতে শুরু হল। জেমস জন্সনের ‘ইউলিসিস’ এই গোলের উপন্যাসেরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইউলিসিসের প্রকাশ সে যুগে যে কতখানি যুগান্তকারী আয়োজন এনেছিল তার পরিচয় অন্যান্য দেশের সাপ্তাহিক সাহিত্যে তাতে আছে, আছে আমাদের বাস্তব উপন্যাসেও। বর্তমানের উপন্যাসগুলিতে মনো-



বিশ্লেষণের নামে সিন্ধবসূচ্য, অসংলগ্ন, নিরুদ্দেশ চেতনা ব্যক্তি গুলিকে উন্মোচিত করে দেবার যে প্রবণতা দেখা যায় তাও জয়সের অনুরূপ। তবে জয়সের মূল গুণ নিহিত ছিল প্রতীক ধর্মীয় ও সংকেত-ভিত্তিক অসংলগ্ন ভাষণের মধ্যে। তিনি স্বল্পতাকে দেখিতে প্রাধাণ্য দেননি, প্রশ্রয়ও দেননি। মূলত তার অশ্লীলতা ছিল প্রাসঙ্গিক ও ইন্টেলেকচুয়াল পোজ। একটি কেরাণীর নিরাই অথচ তীক্ষ্ণ প্রায় নস্টালজিয়ার মধ্যেই তা ছিল সীমাবদ্ধ। পরবর্তীকালের জার্মানিয়া উল্ফ, জর্জ এলিয়ট, এলভাস হান্সলী, রিচার্ডসন প্রভৃতির লেখ্যেও অংশত এই জাতীয় বাণী ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রায় সমসাময়িক কালের ডি. এইচ. লরেন্সের মনোভাষ্যতেই একটু ভিন্নতার স্বাদ পাওয়া বিচিত্র নয়; লরেন্স ছিলেন ভিন্নতর কোটির অধিবাসী। ফ্রয়েড, ইয়ং এর আনুগত্য স্বীকার কোরলেও তিনি কিন্তু তাদের নিষ্ঠুর যথার্থ সত্যানু-সম্মিধাসকে পুরোপুরি অগ্নিকার কোরতে পারেননি।

লরেন্সের পর অধুনা যারা সাহিত্যে আদিম মানব প্রবৃত্তির অশ্বংখ্যাত জয়গান ঘোষণার পুনরায় তৎপর হয়েছেন তাদের মধ্যে আমেরিকার ফকনর, কন্ডওয়েল এবং একটু স্বতন্ত্র কন্ডে নভকভ প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য।

উপসংহারে, সাহিত্যিক অশ্লীলতাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা প্রদান কোরলে মনে হয় এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে, অশ্লীলতা তিন ধরনের হতে পারে। (ক) প্রকরণ বা উপলক্ষ্যনা গত (খ) বিষয় বা ভাব গত এবং (গ) ভাষা গত।

(ক) অনেক সময় লেখকের উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও অন্তর্কণ 'মুহুর্তে' বর্ণনার স্বল্পতার জন্যে অশ্লীলতা প্রশ্রয় পেয়ে থাকে। ভল্টেরায়ের 'কাপিডু' বইটিতে এই জাতীয় অশ্লীলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সামাজিক ও রাজনৈতিক অসংগতি ও ভাঙামীর মধ্যস্থল হলে গিয়ে ঐ গ্রন্থে লেখক অচেতন ভাবেই অশ্লীলতা করে ফেলেছেন। চীনা লেখক 'লাও চাও' এর 'রিঙ্গাওয়াল' বইটিও এই দোষ দুষ্ট। বাঙলা সাহিত্যেও 'দীর্ঘদর্পণ' ও 'সধবার একাদশী' নাটকে, 'নববাবু বিলাস' কাব্যে, এবং সাম্প্রতিক কোন কোন উপন্যাসে এই দোষ দেখা যায়। তবে বর্তমানে পাশ্চাত্যের প্রায় অধিকাংশ সাহিত্যিকই এই দোষে দোষী। ফ্লোরেন্স সার্ট, রোমাক, কাকুকা, প্রুস্ট, ল্যাগেনকিভিট প্রভৃতির মত শিশিলাস্পী লেখকও অশ্লীলতার রাঙতায় মড়ে এককালে তাদের সাহিত্য জগৎপরি করার চেষ্টা করেছিলেন।

(খ) বৈয়াক্যিক অশ্লীলতাই প্রকৃত অশ্লীলতা। মৌপালার 'বেলমি' জাম্বেল বোমার 'পাঁজ র্যান্ডাল', নবকভের 'লোলিতা' অবলম্বিত, নিরুদ্দেশ, জ্ঞানব কামপ্রবৃত্তির অসামাজিক কাহিনী হিসাবে এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। তবে এই জাতীয় গ্রন্থ খুব কমই লেখা হয়। তাই এ ধরনের বিকৃত অর্থ বলিষ্ঠ বই নিয়ে প্রকৃত আলোড়নও হয়ে থাকে। এর উদাহরণ 'লোলিতা'।

(গ) ভাষা গত অশ্লীলতাই অনেকটা ভাষ্যগারিত্বের সমগোত্রীয়। একে গ্রাম্যতাও বলা যায়। হান্স রিসিক বা শম্ভের ভাঙচুর করে কিম্বা খোলাখুলি কোন কিছুর অসংগতি প্রকাশ করে অনেক সময় অশ্লীলতাই এই দোষ করে থাকেন। চার্লস, ওড হাউস, ইম্বর গুপ্ত ইত্যাদির লেখায় আমরা এই জাতীয় অশ্লীলতার বহুল প্রয়োগ দেখে থাকি।

আ লো চ না

— — —

## সৌন্দর্য-তত্ত্ব : রবীন্দ্রনাথ ও শ্লেটো

সুন্দরকে ভালোবাসা মানুষের স্বভাবজাত। পথ চলতে বসন্তের মাতল প্রলোপে কৃচ্ছ্রাভার রঙনি উত্তরায় কার না মনে কেড়ে নিয়েছে? কার না ভালো লাগে হাসির সারয়ে ফুটে থাকা রমণীর এককোড়া কালো হারিণ চোখ? আদিকাল হতে নানা কবি ও শিল্পী এই সুন্দরেরই চিরন্তন জয়গান গেয়ে এসেছেন। যুগে যুগে বিমুখ মানুষ সুন্দরের পরতলে তার অর্থ্য নিবেদন করে বেলেছে, এই লিভিন্দু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর। পুষা হল অশা মম, ধনা হল অন্তর। কিন্তু সে সুন্দর চিরকাল আমাদের মন ভুলিয়েছে, তার তত্ত্ব কি? যে সৌন্দর্য-চেতনার আমাদের হৃদয় উন্মোচিত হয়ে ওঠে তা' কি সম্পূর্ণ উপলব্ধি; না তার পেছনে বস্তুগত একটা দিকও রয়েছে?

এই প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের মতবাদ অনুধাবন করতে গেলে তার বিশিষ্ট জীবন-দর্শন সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথের মতে, এই বিশ্বসৃষ্টির পরিপ্রেকাশ এক অন্তর্দেবতা বিরাজ করছেন, যিনি এক এবং অনন্য। প্রকৃতির নানা রূপ, রস ও রঙ, অন্যদিকে মানুষের প্রেম, তার ভালো লাগা, তার সকল অনুরাগ ও বিরাগের মধ্যে সেই অন্তর্দেবতাই নিজেকে বিচিত্রভাবে প্রকাশ করছেন। প্রভাতে প্রথম সূর্যের রক্তিম আলপনা, দিনশেষে অন্তরঙ্গ গোখলীর বিষম পূরবা, নরনি তৃণতরুলতার শ্যামল প্রাণোচ্ছ্বাস, অর্ধ-পরিচিত প্রিয়জনের মুখচ্ছবি আমাদের যে ভালো লাগছে, তার পেছনে সেই অসীম প্রেমলীলারই প্রকাশ।

এককথায়, ব্যক্তি ও সমস্ত বিচিত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে যিনি সকল কাজের কাজী তার লীলাই প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি যেমন বাজান ভেরী মাদের তেজসী নাচের ভঙ্গী। এই অন্তর্দেবতার সঙ্গে যখন আমাদের মিলন হয়—তখন ব্যক্তের পারি, আমরা শব্দ, ব্যক্তিক ভোষণের ক্ষুদ্র গাভীর তুচ্ছ সুখ-দুঃখ, বাসনা-কামনার মধ্যে সীমায়িত নই—এ পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে আমাদের অখণ্ড একা। তখন আমরা সেই বিশ্বের পরিবাস্য আশ্রয় মগ্নেই নিজেকে দেখতে পাই। তাই বিশ্বের সমস্ত প্রকাশের মধ্য দিয়ে আমি নিজেকেই উপলব্ধি করি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এই আত্মোপলব্ধিতেই সুন্দরের জন্ম। ফলকে সুন্দর বলিছ—কেননা ফলের মধ্য দিয়ে আমি নিজেকেই সত্য করে পাচ্ছি। আর সেজন্যই পলকেও আবেগে আমাদের ভিতরের মানুষ বেড়ে উঠেছে, রাঙিয়ে উঠেছে, —তাই ফলকে বলিছ সুন্দর।

এই আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে, সৌন্দর্য-চেতনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বস্তুর দিকটা একেবারেই অব্যবহার করেছেন। বসন্তের রঙিন কৃচ্ছ্রাভ ফলটি দেখে যে সুন্দর বলে মনে হচ্ছে, তার পেছনে সেই ফলটির নিজস্ব কোন অবদান নেই। ফলটিকে সুন্দর বলে মনে হচ্ছে, কেননা তার মধ্য দিয়ে আমি নিজেকেই পেয়েছি। আমি আছি এবং সুন্দর বলে উপলব্ধি করছি বলেই ফলটি সুন্দর। অর্থাৎ ফলটির যে সৌন্দর্য তা' বস্তুগত নয়; তা' আমি আছি এবং সুন্দর বলিছ বলেই সুন্দর। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :



১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

আমারই চৈতন্যের রঙে পারা হল সবুজ

দুর্নি উঠলো রাঙা হয়ে

আমি চোখ মেললাম আকাশে—

জুড়ে উঠলো আলো

পূর্বে পশ্চিমে

আকাশের দিকে চেয়ে বললাম, সুন্দর—

সুন্দর হল সে।

একটু ভেবে দেখলেই বৃকতে পারা যাবে, রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মতবাদ সম্পূর্ণ সত্য নয়। গোলাপকে সুন্দর বলছি তাই গোলাপ সুন্দর—এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। বস্তুত গোলাপ স্বভাবতই সুন্দর—এই সৌন্দর্য তার অঙ্গরসত্তা সহজিত ও একো। গোলাপের এই স্বভাবগত সৌন্দর্যই আমাদের উপলব্ধির রঙ আরও প্রাথমিক হয়ে উঠেছে। সৌন্দর্যের এই বস্তুগত দিক থাকে হেগেল 'ভৌতরম্যনেত কন্সট্রাক্ট অব রিয়েল পারসিটুলারিটি' বলেছেন তা' রবীন্দ্রমতবাদে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে।

শ্লেটো-মতবাদে আমরা বোধ হয় আর একটি একদেশবাসী নন্দন-তত্ত্বের সম্মুখীন হইছি। সৌন্দর্য-শ্লেটোকে রবীন্দ্রনাথ যেমন সম্পূর্ণ আত্মিক উপলব্ধি বলে অভিহিত করছেন, শ্লেটোর মূর্কে কিন্তু সম্পূর্ণ উদ্ভেট। একেই তিনি বলেছেন, ফর্ম অফ বিউটি। পৃথিবীর সমস্ত সুন্দর বস্তুর প্রেক্ষায় রয়েছে এই ফর্ম বা নিরূপক সুন্দরের অস্তিত্ব। সুতরাং বিভিন্ন বস্তুর সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে আমাদের এই নিরূপক সুন্দর সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হতে হবে। শ্লেটো বলেছেন, প্রথমে আমরা একটি বিশেষ বাস্তব বা বস্তুকে (ধরা যাক, একটি লালফুল অথবা এককান্না সুন্দর মুখ) সুন্দর বলে চিনি। রম্যই আমাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়—তখন আমরা কতকগুলো সুন্দর জিনিষের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারি এবং বৃকতে পারি, এদের সকলের পেছনে একই সুন্দরের অস্তিত্ব রয়েছে। পরের পর্যায়ের আইন বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও যে একটি বিশেষ সৌন্দর্য আছে তা উপলব্ধি করি। কিন্তু যে ফর্ম অফ বিউটি সমস্ত জিনিষকে সুন্দর করে রেখেছে—তাকে উপলব্ধি করতে গেলে আমাদের সংযোজক, জ্যামিত প্রকৃতি কতকগুলি বিজ্ঞান নিষ্ঠা সহকারে অধ্যয়ন করতে হবে। এই পঠন পাঠের মধ্য দিয়েই হঠাৎ আলোর কলকালীর মতো মূলে সৌন্দর্য-চৈতন্যের চিত্র কলকল করে উঠবে। তাই শ্লেটো বলেছেন : তবে যদিও পঠন পাঠন ও চিন্তন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের এই সৌন্দর্য-বোধ আসছে, তবে এই বোধটি সম্পূর্ণ অনন্য এবং আমাদের মন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

সুতরাং বৃকতে পারা যাচ্ছে, শ্লেটোর সৌন্দর্য-তত্ত্বের মূর্তি স্তর স্বীকার করা হয়েছে। প্রথম স্তরে, চিন্তন-প্রক্রিয়া এবং দ্বিতীয় স্তরে মূলে সৌন্দর্যের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে শ্লেটোর এই তত্ত্বকেই নতুন করে সমর্থন করা হয়েছে।

যাই হোক, উপরের আলোচনা থেকে আমাদের এই ধারণাই হচ্ছে যে শ্লেটোর মতে, সৌন্দর্য-বোধ সম্পূর্ণ আত্মা-নিরূপক। একটি মূলকে আমার যখন সুন্দর লাগছে তখন আমার কাছে সুন্দর লাগছে বলসি ওটি সুন্দর নয়। বস্তুত, কোন মানুষের অস্তিত্ব না থাকলেও ফুলটি সুন্দরই থাকবে। কেননা, ফুলটির সৌন্দর্যের মধ্যে নিরূপক সুন্দরই প্রতিফলন হয়েছে—তার রঙের ফলের রঙ, তার রশ্মির ফলের রূপ। কাজেই সুন্দর কখনও মানুষের উপলব্ধি-নিরাসিত নয়।

শ্লেটোর নন্দন-তত্ত্ব সম্পর্কে সশর, তর্ক ও বিচারের যতই অবকাশ থাকুক, কিন্তু আশ্চর্য

পরিধির বাইরে বস্তুত অস্তিত্ব স্বীকার না করলে যে সুন্দর-বোধ হতে পারে না—সে বিষয়ে কোন বিশ্বাসের অবকাশ থাকে উচিত নয়। বস্তুত, নিছক আপনায় মনে মাধুরী মিশিয়ে সুন্দরকে রচনা করা যায় না। তা হলে একটি কুর্বাং দর্শন সৌন্দর্যকেও আমরা সুন্দর বলতে পারি। কিন্তু মানসিক বিকার না থাকলে বোধ হয় আমরা তা কেউই বলতে পারি নে। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যের এই বস্তুগত দিকটি স্বীকৃত হয় নি। অবশ্য তাই বলে সুন্দর সম্পূর্ণ বস্তুগত এবং কোনমতেই উপলব্ধি-নিরাসিত নয়—এ কথাও মেনে নেওয়া যাবে না। প্রকৃতপক্ষে, ইন্দ্রিয়ের জালা দিয়ে বাইরের কোন রূপ যদি শূন্য নিষ্কর্যভাবেই বাস্তবিকভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, তা হলে আর যাই হোক, সুন্দরের চেতনা কখনই হবে না। বাইরের বস্তুর মধ্যে যখন মানুষের সত্তার ও সজ্ঞাশীল উপলব্ধির মিলন হবে—তখনই সুন্দরের জন্ম। এই উপলব্ধিকেই শ্লেটো ইনটাইন্ডন বলেছেন। ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দারের ভাষায়, "বস্তুত্বের অন্তর সম্পর্কের যে অখণ্ডতা অথবা একতা তা যখন পর্যবেক্ষক বা শ্রোতা বা পাঠকের সংবেদনার সংগে মিলিত হয়ে নতুনতর এক এককের ও অখণ্ডতার সৃষ্টি করে, একমাত্র তখনই প্রকৃত সুন্দর-পরিবেশ সৃষ্টি হয়।" কাজেই বাইরের রূপ আমরা শূন্য চোখেই দেখি না, তাকে নতুন করে সৃষ্টিও করে থাকি। আর সুন্দরের অস্তিত্ব যেমন বস্তুর উপরে, তেমনি আমাদের এই সৃষ্টির কাজটুকুর উপরেও সমাপরিমাণে নির্ভরশীল। শিল্পগুরু, অবনীন্দ্রনাথ এই সত্যটিকে প্রকাশ করে বলেছেন :

সুন্দর জিনিষের বাইরের উপকরণে আর ভিতরের পদার্থে হিরহর আত্মা—যেমন রূপ, যেমন ভাব। হিরহরগে যা তার সংগে অন্তরংগে পরিচ্ছেদ মিলন ঘটিয়ে সুন্দর বর্তমান হল। চোখের বাইরে যে পরকথা। তারি সংগে চোখের ভিতরে যে মন-দর্শন তার যোগাযোগে পরিচ্ছেদা হল; তখনই সুন্দর ভাবে দেখতে পাওয়া গেল বিশ্বের জিনিষ..... রবীন্দ্রনাথ বা শ্লেটো কারুর নন্দন-তত্ত্বের বাইরের উপকরণের সংগে ভিতরের পদার্থের পরিচ্ছেদা মিলন ঘটে নি।

## কল্যাণ সেনগুপ্ত

### কামিনী-কান্থন

আমাদের দেশে যারা মোক্ষ সাধনা করেন তাদের একটা বাঁধা বুলি আছে—সেটা কামিনী-কান্থন ভাগের উপদেশ। কামিনী এবং কান্থন সোভ দেখার, পথ ভোগার, মূর্কে নিয়ে যার মূর্কের পথ থেকে। যদি সেই সকল বৃদ্ধির অতীত পরমকে পেতে হয়, যদি মোক্ষ লাভের বাসনা থাকে তবে কামিনী কান্থন ছাড়া—ওরা মায়া, ওরা মোহ, ওরা মন জড়িয়ে রাখে কলুষে প্লাবিত, ভরিয়ে দিয়ে মিথ্যায়।

এ সব কথা আমার বৃদ্ধির অতীত—কেন এই ভোগ্য কিসের জন্য এই মূর্কা? অনির্দেশ অবস্থার মধ্যে সে কোন পরম শান্তি, যার জন্য সব ছাড়তে হবে। এই নৈতিবাচক সাধনা কোন পরম ইতিহাসে নিকট করে আসবে।

যে সংসারে একমুখ এর আলো বাতাস, মাটি জল তৃণতরু, মানুষ সব কিছুর মধ্যে যে রহস্যের লীলা চলছে তাকে অস্বীকার করা, তার থেকে মুখ ফিরায়ে পরমশ্রমের মধ্যে চরমের সম্মানকে বেহীন করে মানবে। এর সব মিথ্যা, এ সবই মোহ আর সব কিছুর ছাপিয়ে যিনি অনন্ত গোপন সত্য শূন্যে তিনিই? নিজেই কোন করে ভোক্তার পারবোনা বলেই তো এই সংসারের







## সংস্কৃতি প্রসঙ্গে

নূন, তেল, লুকড়ীর সন্ধানেন বেশীর ভাগ জীবন আজ আমরা। সওয়া ও সদাগরী জীবন ছাড়িয়ে উঠে। আকাশের দিকে তাকবার স্পর্শ বা অবসর ক'জনর রয়েছে? ভাগ্যশারীর, প্রাতিমন, হুমছাড়া জীবনের তার নিয়ে পথে পথে ফিরি করে বেড়াচ্ছে সাধারণ লোক। তাদের অবসর ফোতামিন শব্দ, চায় আয়াসহীন আরাম। এই আরামের পিছনে কোন ভিতরকার আবেগ বা ইমোশানের বলাই নেই। আছে শব্দ, লোভী কামুক প্রবৃত্তি যা অঙ্গ আয়াসে ইন্দিয় চরিতার্থ করবার জন্যে দিনরাত লুটোপুটি করে। আজ তাই বেশীর ভাগ লোকের স্ফূর্তির বা আনন্দের রসদয়ার হোল সারি সারি সিনেমা, বেসের লবুগান, অর্থহীন প্রলাপ বলবার সভামণ্ড এর সাথে সাজানো রয়েছে সস্তাদরের যৌনিবিকারের নানান ছবি ও বই-এর রাশি। যান্ত্রিক জীবনে আমাদের কুৎসিত প্রবৃত্তি নিজেকে পুরোপুরি চরিতার্থ করার জন্যে চারিদিকে পথ খুঁজে মরছে তা তথাকথিত সংস্কৃতির রঙিন পর্দার অন্তরালে হউক বা প্রকাশে সর্বসাধারণের সম্মুখে অভিনয় করে হউক। আজ আমাদের জীবনধারা হয়েছে অবচেতন মনের বাহ্যিকপ্রকাশ। জীবনের সুন্দর ও শোভন দিক হয়েছে উঠাও। মন নিপ্রাণ জড়জগতের একটি সাজানো বস্তু হয়েছে, আর আমরা সদাগরী বোকারো নিজেই বিকসে দিয়ে জীবনধারণ করছি, আমরা যত জীবনের প্রবহমান স্রোত থেকে দূরে সরে যাচ্ছি তত জীবন আমাদের কাছে হেয়ালী, দুঃস্বপ্ন মনে হচ্ছে। সংস্কৃতিক জীবন থেকে আমরা যত বিচ্যুত হচ্ছি তত সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের বাইরের বস্তুতার আসর উঠছে জমে, অথবা মানোজ্ঞ ভাষণ দিয়ে তথাকথিত প্রাজ্ঞ শিকাবিদ্যা আশ্বপ্রদান করছেন। আজ আমাদের উপলব্ধি করতে হবে সংস্কৃতি কিংবদন্তীলোকের আশ্বসর, তর্জনিত আখ্যানভিত্তি বা প্রণীত বিলাস নয়। সংস্কৃতি হোল সভ্যতার সার মর্ম, মানব জীবনের পরমবিকাশ। দু' একটি কথার ভিতর সংস্কৃতির ব্যাপ্তি ও মূল কথা সুস্পষ্ট করা সম্ভব নয়। জীবন অথবা মানসলোকে এমন কোন বিশেষ দিক বা অংশ নেই যাকে বিশেষভাবে আমরা সংস্কৃতি প্রতীকিত বা মূল্যবোধ বলে ধরতে পারি। আমরা যদি সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভিতর তুলনামূলক আলোচনা করি তাহলে সভ্যতাকে আমরা সমাজ জীবনের ধারক ও বাহ্যিক বলে অভিহিত করতে পারি। সামাজিক কাটামোর রূপারিবর্তনের সাথে আমাদের জীবনযাত্রা, ইতিহাসের সার, রুচি ও বিকারের নিয়তি পরিবর্তন হয়ে চলেছে। যুগে যুগে ধরে সমাজ জীবনের নানা সম্বন্ধ ও অগ্রগতির সাথে তা মিলিয়ে আমরা একদা একটি উচ্চতর জীবনযাত্রা ও উন্নত স্তরে এসে পৌঁছিচ্ছিলাম। এই সমাজ অঙ্গনে পারস্পরিক যোগসাদন হয়েছে নিবিড় ও এখানে বাস্তববোধে অবাধে তার মানসলোকে অনুসরণ ও তার স্বকীয় সৃজনী প্রতিভাকে প্রকাশ ও রূপায়ণ করতে পারে। এই সামাজিক জীবনের উৎস অথবা প্রতিষ্ঠান হোল সভ্যতা যার প্রাণধারা সামাজিক জীবনের নানা অঙ্গকে ও বাস্তব মানসকে নানাভাবে পুষ্টি সাধন করছে। নির্মম প্রকৃতির সাথে নিরন্তর সংগ্রামের সাথে সাথে মানুষ চমক শিকারী জীবন পরি-ভাগ্য করে কৃষিক্ষেত্রে শ্রম নিয়োজিত করেছে। অশ্ব ঝড়তা গেল সরে, সৃজনী প্রতিভা, ভাবের

নিরন্তর দোলা, আবাস স্বাধীন শিল্প, দর্শন ও ধর্মের মাধ্যমে নিজেই প্রকাশ করে চলে। ভাষা শিল্পকলা, দর্শন, ধর্ম, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক নানা আচার বিচার নানা স্রোতের ভিতর দিয়ে সংস্কৃতি আমাদের জীবনকে করছে সুন্দর ও শোভন।

“সিভিলাইজেশন”, যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিয়ে তজ্জ্বা করছি, তার স্বার্থ প্রতীক আদ্যের ভাষার পাওয়া সহজ নয়। এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল মনু, তাকে বলেছেন সদাচার। অর্থাৎ, তা কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন। এই নিয়মগুলির সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যে ধারণা ছিল সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোলবৃত্তের মধ্যে বদ্ধ। সরস্বতী ও দৃশ্যদ্বতী যে দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারস্পরিক ক্রমে চলে এসেছে তাতেই বলে সদাচার।” (রবীন্দ্রনাথ—সভ্যতার সংস্কৃতি) সভ্যতা বলতে আমরা সাধারণত বলে থাকি সদাচার, রুচিমাণ্ডিত সংস্কৃতিক জীবনের উৎস ও ধারক। দর্শন, সাহিত্য অথবা মানসিক জীবনের অনাকোন সৃষ্টি এককভাবে সংস্কৃতি নামের পর্দার আঁতরণ হতে পারেনা। মানসিক জীবনের সমস্ত সৃষ্টি ও অবদানকে সমন্বয় করে যে যৌগিক ফল বা অপূর্ণ হার্মনি সৃষ্টি হচ্ছে তাকেই আমরা বলব কৃষ্টি বা সংস্কৃতি। কবির কথাত সংস্কৃতি হোল অন্তরহীরকের শব্দজ্যোতি। এই বিজ্ঞানিত, বিকারী আলোধারা স্তব্ধচ্ছন্দে, আনন রসে, গম্ভে নিজে মাতোয়ারা। মনের নিয়ত কণ্ঠ, ভাব আবেগের বিচিত্র প্রকাশ, আমাদের অন্তর জীবন সঙ্গীত, কলা, সাহিত্য, সৈন্যদল সামাজিক আচার বিচার, বিধি পানি, উৎসব ও অনুষ্ঠান নানারূপে, নানাভাবে নিয়ত বহিঃজগতে আশ্বপ্রকাশ করে থাকে। সভ্যজগতে এই সমস্ত মার্জিত চিত্তবৃত্তি, আচার অনুষ্ঠানের উপর গড় ওঠে সংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন সৌধ। সভ্যতার বিনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে আছে সংস্কৃতিক জীবন। সভ্যতা ছাড়া সংস্কৃতি সম্ভব নয়, সভ্যতা সংস্কৃতির বাহক কিন্তু সংস্কৃতি ছাড়া সভ্যতার অস্তিত্ব ভাবা অসম্ভব নয়, যেন অনেক সভ্যতা রয়েছে যেখানে আজও সংস্কৃতিক বিকাশ সর্বাঙ্গীনভাবে বিকশিত হয়নি। আমাদের সভ্যজগতে বিভিন্ন দেশে আজও সংস্কৃতির আলো সমাজের মন্দিরিয়ে লোকের ভিতর সীমাবদ্ধ, সমাজের বিভিন্ন স্তরে সেই আলোকধারা ছড়িয়ে পড়েনি। আজ সভ্যতার সংস্কৃতি বলতে দু'ব অর্থ, অর্থ সংস্কৃতিক জীবন, মন্দিরিয়ে লোকের বিলাসবাসনের ইচ্ছা জোগাতে অর্গণিত লোকের সারাজীবন অর্থ, মুক হয়ে আত্মবলি ও দেওয়া।

ইতিহাসের নিদারুণ পরিহাস যে যুগযুগান্তর ধরে আমাদের মনীষা, কাব্য, কলা, দর্শনের বিচিত্র অনুভূতি বারবার সমাজের এক সামান্য অংশকে স্পর্শ করে থাকে অধিকাংশ স্তর আদিম বন্যভূমি ও পশুজীবনের নবতম সংস্করণ অথবা পুণ্যবৃত্তি বললে ভুল হবে না। আমাদের দেশে যুগে অথবা শব্দর, কালিদাস অথবা রবীন্দ্রনাথ, ওদের দেশে গ্যারেট অথবা সেক্সপীয়ার, স্পীনাভো অথবা কাণ্ট সাধারণত শিক্ষিত বিনোদ্যসাহী মহল ছাড়া সমাজের বিভিন্ন প্রান্তের অপাত্তের। মানব মনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের সাথে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সমাজের নীচের তারা বাসিন্দাদের কোন পরিচয় হবার সম্ভাবনা হয়ে উঠে না। তারা সেই ভিতরিয়ে সেই ভিতরিয়ে বাস করে। আজ সংস্কৃতির বাহক যারা হবেন তাদের দীর্ঘদিনের প্রচীর তেঙ্গে বহু, অনাছড় সংস্কৃতির আলো সবার মনে ছড়িয়ে দিতে হবে। সমাজের সারা অঙ্গ যেন অমৃতের স্পর্শে নব জীবন লাভ করে। জন-সাধারণের অঙ্গ মনকে নাড়া দিয়ে, সুস্ত চ্যতনাকে উদ্দীপিত করে যারা সমাজ জীবনকে পুনর্গঠন করবেন তারা হবেন সভ্যতার সংস্কৃতির বাহক, বলিষ্ঠ প্রাণের পূজারী।

সংস্কৃতির সারসংক্ষেপ



**রবীন্দ্র জীবনী ১।** প্রভাত মুখোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী। কলিকাতা। মূল্য: ছয়টাকা  
**সৌখিন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ ২।** হেমেন্দ্রকুমার রায়। ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী। কলিকাতা। মূল্য: সাড়ে তিন টাকা  
**আমাদের শাস্তিনিকেতন ৩।** সুধীরঞ্জন দাস। বিশ্বভারতী। কলিকাতা। মূল্য: পাঁচটাকা  
**বিত্তীর্থ ৪।** বিনায়ক সাম্বাল। বেঙ্গল পাবলিশার্স। কলিকাতা। মূল্য: চারটাকা

প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনীর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। ইদানীং বিশ্বভারতীর যে সমস্ত নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিই মূল্যবান এবং রবীন্দ্র অনুরাগীদের ভাল লাগবার মত একথা আমরা ইতিপূর্বে বহুবার বর্ণনাছি। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের বৃন্দারতন গ্রন্থটির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ যে প্রয়োজন একথা আমরা বাংলার পাঠকমণ্ডলী, বহুবার অনুভব করছি। সাধারণ পাঠকরা যাতে কবিজীবনের সাধারণ ঘটনাগুলিকে জানতে পারে, সপ্তে সপ্তে প্রিয় বৃন্দের সৃষ্টির পটভূমির সপ্তেও পরিচিত হতে পারে তাইই জনা এ গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল।

রবীন্দ্রনাথের নির্ভরযোগ্য জীবনী একটিই। রামমোহনের বাংলা জীবনী নগেন চট্টোপাধ্যায় মশাই লিখেছিলেন। সেটা তথ্যবহুল কিন্তু জটিল, সহজ করে লেখা নয়। রামমোহনের অন্য ভাল জীবনী বিশেষী ভক্তদের লেখা। বিদ্যাসাগরের একাধিক জীবনী আছে এবং ভাল জীবনীই আছে। চণ্ডীচরণ, সহোদর শম্ভু, সুবল মিত্র, সাম্প্রতিক কালে বিনয় ঘোষ বিদ্যাসাগরের পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখেছেন। রামমোহন বিদ্যাসাগরের মানুষের চিত্রতাকে যেমন প্রথম স্থিতির দ্বারা প্রভাবিত করেছেন তেমনি কর্মের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে তাঁদের বলস্ফূর্ত বাগ্মণী জাতি দেখেছে। তাঁদের কৃতকর্মের ব্যাখ্যা স্বপক্ষে বা বিপক্ষে হোক করা কঠিন নয়। ঐতিহাসিকের সচেতন দৃষ্টি থাকলে মানবচরিত্রের মহা সম্বন্ধে প্রশ্ন থাকলে এই ভাবুক কর্মীপুরুষদের জীবনী লেখা অসত্য ও ধারাবাহিক বিন্যাসের দিক থেকে কঠিন নয়।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এ কথা খাটেনা। শব্দ কৃতকর্মের পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথের আসল রূপ প্রকাশ করার চেষ্টা মুখ্যতার নামান্তর। যে গভীর ভাবের তরঙ্গ একটি জীবনকে কেন্দ্র করে জাতিতে স্পারিত করে গেল তার কোন ধরা ছোঁওয়া রূপ নেই। শাস্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা, ভদ্র-সমাজের মেয়েদের সংস্কার ঘটিয়ে নাচগানের মর্যাদা বাচানো, বাংলা ভাষাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী প্রতিভার কতকগুলি পরিচয় দেয়। বিরাট সৃষ্টি রইলো, বিরাট ঐতিহ্য সেই সৃষ্টির ভাববস্তু—একথা বোঝবার জাতিতেই অভাব।

প্রভাত মুখোপাধ্যায় সেই কাজ করেছেন। লোক ইতিমধ্যেই তাঁকে রবীন্দ্রপুস্তকাকারের প্রশংসা জানিয়েছে। এ গ্রন্থ প্রত্যেকটি মূল্যবল্লভের ছাত্র, ধরের মেয়েদের কাছে সারদের অবাধিত হোক এ কামনা আমরা করি।

মনে আছে যখন আমরা ছাত্র তখন একবার নাট্যচর্চা শিশিরকুমার ভাদুড়ীর কাছে কার্যোপলক্ষে গিয়েছিলুম। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর রেকর্ডে শুনোছি। শব্দ উচ্চ-

গ্রামে বাঁধা কিন্তু জলনমস্ত গান্ধীর্থ যেন তাতে নেই। শিশিরবাবুকে সে কথা জানাতে তিনি অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন। পাশে এক ভদ্রলোক বসে ছিলেন—তাকে ডেকে বললেন ‘শুনো আজ-কাল ছেলেদের কথা, রবীন্দ্রনাথের নাকি গলায় জোর ছিলনা’ তারপর তিনি আমাদের বাসরে বললেন দু-একটা কাহিনী—রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের। তাঁর অনবদ্য বাচন ভগ্নগীতে বা শব্দনে-ছিলুম তা আজও মনে করে তৃপ্ত পাই।

বিচিত্র রবীন্দ্র প্রতিভার আর একটি দিক আমাদের সামনে খুলে ধরলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভা ভারতের তথা পৃথিবীর অন্য বড় বড় লোকদের বহু ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে গেছে—তিনি কালজয়ী কবি, মহৎ চিন্তানায়ক, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সরকারী জাদির সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা একথা আজ আর গল্প কথা রইলো না—তথ্যের সমাবেশে তা সত্যের প্রতিষ্ঠা পেলে।

লেখক সৌখিন নাট্যকলার ধারার আলোচনা করে একটি কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, তা হলো এই যে রবীন্দ্রনাথই বাংলাদেশের একমাত্র নাট্যকার যিনি পেশাদার রপমণ্ডের দিকে না তাকিয়ে নৃতন ভগ্নী নৃতন সুন্দর, নৃতন ভাবের নাটক তৈরী করেছেন। এবং তা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে। এই কথাটির উপর রবীন্দ্রনাথকে ভাল ভাবে বোঝা নির্ভর করছে। তিনি শব্দ, সংলাপের ভাষা বদলে ক্ষান্ত হননি, তিনি নাট্যমণ্ডের পট পরিবর্তন করে—অতিরিক্ত বর্ণ ও সম্ভার আড়ম্বর থেকে মঞ্চকে মুক্তি দিয়েছেন। গানে জাতিনটকীয় বিকৃতিকে সুদের সহজ গতির দ্বারা সরিয়ে দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন করেছিলেন নাটকে ভাবের ছোঁয়া লাগিয়ে। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম দুটি অধ্যায়ে লেখক যে সব কথা বলেছেন তা ইতিপূর্বে বহু সমালোচকের নাট আলোচনার মধ্যে স্থান পেয়েছে। তাই সাধারণ সম্ভারী পাঠকের কাছে দুই-ই অধ্যায় খুব চিত্তাকর্ষক হয়নি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম অভিনয় অংশটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে কিছু জানবার ঔৎসুক্যেই এ গ্রন্থ আমরা পড়তে শুরু করেছিলাম।

একথা মনেহই হবে যে লেখক আমাদের নটক করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম মঞ্চা-বর্তন সম্পর্কে প্রভাত মুখোপাধ্যায় এবং বেঙ্গল চট্টোপাধ্যায়ের পরপর বিরোধী অভিমত লেখক তুলে দিয়েছেন—বদ্বিও দুই বিরোধী তত্ত্বের মধ্যে কোন সমন্বয় করা যায়নি। রবীন্দ্রনাথের নারীভূমিকার অভিনয় এবং অর্ধশেষের সঙ্গে অভিনয়ের তথ্যও ঔৎসবনবাবু'র কাছে থেখেই তুলে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজের নাটক মণ্ডে অভিনয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে লেখেন নি বটে কিন্তু তার নাটকগুলিকে কেটে ছেটে পরে অভিনয়ের উপযোগী করে নিয়েছেন। ‘রাজা ও রাণী’ ‘তপস্বী’ প্রভৃতি নাটকের আলোচনায় লেখক এ বিষয়ে যে আলোচনা করেছেন তা ভাল লাগবার মতো। বিভিন্ন সৌখিন নট ও পেশাদার নট কেমন করে তাঁর বিভিন্ন চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন সে সম্পর্কেও লেখক বহু জ্ঞাতব্য সংবাদ দিয়েছেন। নট ও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে এমনভাবে জানবার সুযোগ দিয়ে লেখক আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

শাস্তিনিকেতনের প্রাক্তন গ্রীষ্মঈশ্বরীন দাস সম্প্রতি বিশ্বভারতীর উপাচার্য হয়েছেন। শাস্তিনিকেতনের সাম্প্রতিক কালের সকল দলপালির তিনি উদ্ভূত এমন সন্মান তাঁর আছে। ফলে শ্রমের লোক আশা করে আছে যে তাঁর নেতৃত্বে আবার শাস্তিনিকেতন তার পূর্ব সন্মান ফিরে পাবে। উপাচার্যের পদ নেবার সঙ্গে সঙ্গে পরিচার্য সংবাদ বেরলো সুধীরঞ্জন প্রভাতী বৈতালিক যোগ দিয়েছেন, উপাসনা মন্দিরে নিজেকে হাজির হয়েছেন। শাস্তিনিকেতনের উপাচার্য পদ হতে তাঁর চাকরী নয় এ তাঁর ছাত্রজীবনের স্বাভাবিক পরিণতি—যে প্রতিষ্ঠান তাঁকে



বড় করেছ, ভাষাবাসার পরিপ্রসে তারই সেবা করা।

আমাদের শান্তিনিকেতন তার বালাকালে দেখা শান্তিনিকেতনের ছবি। তখনকার শান্তিনিকেতনের ছবি। তখনকার শান্তিনিকেতন এখনকার মত পাকাবাড়ীর সারিতে ভরে ওঠেনি। খোলা মাঠ চলে গেছে আবরিত। মানদুর্গাও তেমনি বিচিত্র। এই সব অভিজ্ঞতার ছবিতে 'আমাদের শান্তিনিকেতন' আশ্রম উজ্জ্বল। শিবজেন্দ্রনাথ, জগদানন্দ, দিনেন্দ্রনাথ প্রভৃতির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ ছবি লেখক ফুটিয়েছেন। স্মরণ রবীন্দ্রনাথ সে পরিমাণে অল্প জায়গা জুড়েছেন। অখ্যাত চরিত্র যে কত আছে তার ঠিক নেই।

শান্তিনিকেতন তখন সব গড়ে ওঠার মধ্যে। আজকের জৌলুয় তার তখনও আসেনি। সেই জন্যই তার প্রাণ ছিল; প্রকৃতি তখনও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার যোগে বাঁধা।

শান্তিনিকেতনের জীবনেও একটা রীতি ছিল। কিন্তু রীতি আর রুটিন এক নয়। রুটিনবস্তৃতার যান্ত্রিকতা ছিলনা। তাই লেখকও বাধ্যধরা উপায়ে রুটিনের ছকে জীবনের দিন-গুলোকে মনে করেন নি। যে বিচিত্র প্রাণরস লেখক শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি ও মানদুর্গার জীবন ও শিক্ষা থেকে গ্রহণ করেছিলেন তারই কাহিনী প্রকাশিত এই গ্রন্থে।

পুরানো দিনের শান্তিনিকেতনের মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের উপাসনা, সর্দারের কাছে শোনা দেবেন্দ্রনাথের বিশদ্রকর প্রতিভার গল্প, জগদানন্দ বাবুর ধর্মকর সঙ্গে সঙ্গে একই পংক্তিতে বসেছে গুরুদেবের বাহন উমাচরণ, ইরেজীনবীশ আত্মা। যদিও গল্পাকারে বলা হয়েছে তবু গল্পের রস বজায় রেখেও ইতিহাসের তথ্য খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়।

বিশ্বভারতী কতৃপক্ষ যে পরিমাণ চিত্রসম্ভারে গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছেন তা সমালোচকের সম্মতবোধের অপেক্ষা রাখেনি। এ গ্রন্থ শব্দে সর্দারগুণের স্মৃতিচিহ্ন সমাবেশেই নয়—ক্রেম্ট শিল্পীদের রচনায় ছোটখাটো এলবামও বটে।

বাস্তবধর্মীরা কোন মহৎ সাহিত্যের একমাত্র গুণ হতে পারে না। সাহিত্য শব্দে বস্তুত্বের প্রতিফলন নয়—তার মধ্যে একটা অংশ হল লেখকের মন। সেই মন কেমন করে দেখছে, কেমন করে রঙ ফলাচ্ছে, কেমন করে রূপের জন্ম দিচ্ছে—তারই মধ্যে সাহিত্যের পরিচয়। মহৎ শ্রদ্ধা যারা তাদের এই মনের রহস্যই সমালোচনার বিষয় হয়েছে বহুকাল ধরে।

ঈশ্বরগুণ থেকে বর্ষাক্ষমচন্দ্র-হেমচন্দ্র-বীনচন্দ্র পর্যন্ত বাগদালা সাহিত্যিকদের মনের যে গতি তা প্রধানত বাস্তবদায়ণ—বিষয়বস্তুর ভিতরকার রোমান্টিক ছাড়া লেখকদের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী আর কোথাও প্রকাশ পায় নি। মধুসূদন ও বিহারীলালের মন স্বাভাবিক নয়—একজন অতি উগ্র আবেগে জ্বলন্ত আর একজন আত্মভোলা আবেগে আত্মবিস্মৃত। এই ধারার শেষ পুরুষ রবীন্দ্রনাথ। নানা রূপের বিচিত্র সম্মানে তিনি রূপবন্ধ রোমান্টিক। ভাবের প্রকাশ যে কত প্রত্যেক সম্মান করছে এ তার স্পর্শপ্রবণ মন বৃদ্ধিতে দেরী করে নি। যখন সীমারীতি পৃথিবীর নানা সীমাহীন বাজনা তার কবিমনের কাছে ধরা পড়েছে তখনই তাকে প্রকাশের বাহন খুঁজতে হয়েছে—বাংলা সাহিত্যের প্রাণগণ নতুন রূপের দেখা পাওয়া গেছে।

রূপসম্মানের একটি ক্ষেত্রের আলোচনা করেছেন বিনায়ক সামাল। তার প্রথম প্রবন্ধই রহস্যবাদ ও রবীন্দ্রনাথ। তাছাড়া রবীন্দ্রকব্যো-রূপক, অচলারাম, মজুমদার, রক্তকরবী প্রভৃতি আলোচনাও সেই রূপসম্মানের রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ। সাধারণ পাঠকের পক্ষে সহজবোধ্য না হলেও উৎসুকচিত্ত রসিকের আগ্রহের কারণ হবে এ গ্রন্থ।

সোমেন বন্দ্য

## সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ...

কোন অগস হুপুরে নিরন্তর কোন জলাশয়ে টিল ছুঁড়েছেন  
কখনও ? লক্ষ্য করেছেন, জলে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাতে বৃত্ত  
থেকে বৃহত্তর বৃত্তের সৃষ্টি হ'তে হ'তে ক্রমে তা' জলাশয়ের তটকে  
স্পর্শ করে ? ট্রেনের বিপদ-জাপক শৃঙ্খলের অযথা প্রয়োগেও  
যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তার ফলও এমনি সুদূরপ্রসারী—কোন বিশেষ  
ট্রেনের যাত্রাই শুধু তা'তে বিস্তৃত হয় না, পর পর বহু ট্রেনই বিলম্বিত হয়।  
ফলে, যাত্রী ও রেল প্রতিষ্ঠান—উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং আর্থিক  
ক্ষতি সরকারী তহবিল থেকেই মেটাতে হয়। আর, এই ঘটনার সঙ্গে  
একেবারেই সংশ্লিষ্ট সাধারণ মানুষই এই  
ক্ষতির দায় বহন করে থাকেন।



পূর্ব রেলওয়ে

\* অগরিহা  
প্রত্যাহারের  
অভাব বিপদ-শৃঙ্খল,  
অযথা ব্যবহারের  
ফল নয়।